অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই, "হ্রাসবৃদ্ধি" কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু [illegible] বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন—"হ্রাস বৃদ্ধির কথাটা বলিয়া [illegible]র একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটি ক্রমাগতই বড় হইতেছে! কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ডুবিতেছে বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।"—ছোট ছেলেটি যে ক্রমে বড় হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড় হইয়া থাকে সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রে সেটা আর তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও

যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।—মামলায় মরণ। মাম্‌লা মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কিরূপ সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে—সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙ্গালীর ঘরে মাম্‌লা মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মাম্‌লার পরিবর্ত্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মত এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মাম্‌লা ত একপ্রকার আইনসঙ্গত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্ব্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশ বাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে মকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।—মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রবন্ধে জেনেরাল্ বুথ যে কিরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক্ আমাদের—বাঙ্গালীদের—অত্যগ্র

আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় ত সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ। প্রভাবতী সম্ভাষণ। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণা-রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই।—লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, "উনি আর তোমায় ভাল বাস্‌বেন না।" তুমি অমনি শিরশ্চালন পূর্ব্বক, "ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি" এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, "না ভাল বস্‌বি" এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্ত্তিহীন বদনে, "তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো" এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।"—

"মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব" প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। "নূতন বাড়ি" গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না—প্রভু মহেন্দ্রনাথ বাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবী ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে।

(রূপকথা)

১

প্রভাতে।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে' দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে।

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,'
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,'
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,'
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে।

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,'
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'

আপন মণিহার মনোভুলে
　দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
　রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
　নদীর তীরে এক শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
　যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
　স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
　দেখিছে কার সুধা হাসি!
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক্,
　নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
　রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
　পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
　স্বপনে কেটে যায় রাতি।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন-আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া

বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্‌ করে, এই চিত্রিত-বৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত, এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র ফেন-শুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মত আকাশ দিক্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজ-

পুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্র-তীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিক্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙ্গাৎ, পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।"

রাজপুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র

কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না, এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ, ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন্, চিঁড়েতন, হর্তন অথবা রুহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ

করিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুঁতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্‌নি একান্ত যথাযথ, এম্‌নি পরিপাটি, এম্‌নি প্রাচীন, এম্‌নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙ্গাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়! এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্‌নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা,

মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্‌নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে

নাই—নির্ব্বাক্ নিরুদ্বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্ণে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ, তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাঙ্গাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূতপূর্ব্ব শোভা,

এ কি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল! তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষ্যা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হোক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিণীর এত সাজের ধূম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকম-সকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরা-ইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত একটাও কথা

যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙ্গে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্ থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জ্বলিতেছে এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি আন, তুরি ভেরি বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি কর, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরি-ভেরি লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের মধ্যে তেম্নি হইতে লাগিল।

এম্নি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড় মধুরস্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই তাহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায়

একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারাণী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলংঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

স্বরলিপি।

(রাজা ও রাণী হইতে)

রাগিণী মিশ্র—কাওয়ালি।

সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে কি মনমাঝে!

বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল ?
বল গো সজনি এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে !
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে !
না জানি কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার সাজে !

৪|৩

॥ রা রা। ঙ্গা -া -া -া। -া -া রা সা। রা -া -সা -রসা।
॥ স খী। ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি —।

॥

। ন্‌া -া সা -া। -া -গা গা গা। মা -া -া -পা।
। বা — জে —। — — স খী। ঐ — — —।

। মপমা ঙ্গা রঙ্গরা সা। ^স^রসা -ন্‌া সা -া। -ন্‌সা -রা রা রা।
। বু ঝি বাঁ শি। বা — জে —। — — স খী।

। ঙ্গা -া -া -া। -রঙ্গা -মঙ্গা রা সা। রা -া সা -রসা।
। ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি —।

। ন্‌া -া সা -া। {-া -া গা মা। পা -া পা -া।
। বা — জে —। {— — ব ন। মা — ঝে —।

। পা -া ধা র্সা। ঞর্সঞা -ধা পা -া। -া -মপমা গা মা।
। কি — ম ন। মা — ঝে —। — — ব ন।

। গমা -পা পা -া। পা -ধা -ঞা -ধর্সা। ঞা -ধঞধা পা -ধপা।
। মা — ঝে —। কি — — —। ম — ন —।

। মপা -মধা পা -া । -া -জ্ঞা ॥ মা -া পা -া । পা -না না -া ।
। মা — ঝে — । — — ॥ ব — স — । স্ত — বা য় ।

। না নর্সা ধা -না । র্সাঃ -নঃ র্সর্রা র্সনা -র্সা । না র্সা -া র্রা ।
। ব হি ছে — । কো — থা য় । কো থা য় ফু ।

। র্রা -া র্রর্সা -র্রা । র্জ্ঞা -া -া -া । র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা ।
। টে — ছে — । ফু — — ল্ । ব ল গো — ।

। র্রা র্সা র্সা -া । র্সা নর্রা র্সা -া । ঞা ধা পমা -গমা ।
। স্ব জ নী — । এ সু খ — । র জ নী — ।

। পধা -পর্সা ঞা -া । ধঞা -ধা পা মপা । গা -জ্ঞগা মা -া }॥
। কো ·ন্ থা — । নে — উ দি । য়া — ছে — }॥

। ন্া সা রা -জ্ঞা । রা মা জ্ঞমা -জ্ঞরা । সা রা সা রনা ।
। যা ব কি — । যা ব না — । মি ছে এ ই ।

। ন্া ন্া সা -া । সমা মা মা -া । পা -া পা ধা ।
। ভা ব না — । মি ছে ম — । রি — লো ক ।

। ঞা -ধর্রা র্সা -া । -া -ঞধপা মা মা । গমপা পা পা -া ।
। লা — জে — । — — স খী । মি ছে ম — ।

। পা ধপা পা -ধা । ঞধা -র্রা র্সা -া । র্সা র্রা র্রা -র্জ্ঞা ।
। রি লো ক — । লা — জে — । না জা নি — ।

। র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্রা । র্সা নর্সর্রা র্সা -া । ঞা ধা পমা -গমা ।
। কো থা সে — । বি র হ — । হু তা শে — ।

। পা পর্সা না না । না -া নধা -না । র্সা -না র্সর্রা র্সনা -র্সা }॥
। ফি রে অ ভি । সা — র — । সা — জে — }॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বর।

উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্‌। খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

২। ঙ্গ=কোমল গ; ঞ=কোমল ন; দ=কোমল ধ; ল=কোমল র; হ্ম=কড়ি ম।

৩। উপরোক্ত স্বরাক্ষরগুলির গায়ে এক একটি আকার বসাইলেই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। যথা সা=এক মাত্রা; সা -া=দুই মাত্রা; সা -া -া=তিনমাত্রা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন বিসর্গ, যথা সঃ; দেড় মাত্রা, যথা সাঃ; অর্দ্ধ-মাত্রা প্রভৃতি খণ্ডমাত্রার চিহ্ন অতি অল্প স্থলেই আবশ্যক হয়—অনেক সময়েই স্বরাক্ষরগুলি একত্র করিয়া তাহার গায়ে একটি আকার দিয়া এক মাত্রার সামিলে আনা হয়। যে স্বর কেবল ঈষৎ মাত্র ছুঁইয়া যায় তাহার স্থায়িত্ব-কালকে স্পর্শ-মাত্রা বলে। এই স্পর্শমাত্রার স্বরগুলি ছোট অক্ষরে মূল স্বরের পার্শে বসাইতে হয় যথা—এই গানের তৃতীয় স্বর-পংক্তির আরম্ভে "সরসা"।

৪। দুই ছেদের মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলি এক একটি তালের অন্তর্গত। প্রতি ছেদের পরবর্ত্তী স্বরের উপর তালের ঝোঁক্‌টা পড়ে। এই ছেদ-বিভক্ত অংশগুলিকে তাল-বিভাগ বা পদ বলে। এই প্রত্যেক তাল-বিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই গানের প্রত্যেক তাল-বিভাগ চারিটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া আছে। প্রথমেই যে দুই মাত্রা দেখিতেছে, উহার সহিত প্রথম চরণের শেষ পদের দুই মাত্রা যোগ হইয়া চারি মাত্রা পূরণ হইয়াছে।

৫। গানের শিরোদেশে ৪।৩ এই যে তালাঙ্ক চিহ্ন আছে, ইহার অর্থ এই, এই গানটির অন্তর্গত প্রত্যেক তাল-বিভাগ যতটি মাত্রায় বিভক্ত তাহারই মোট সংখ্যা আকারটির বামপার্শ্বে স্থাপিত; এই গানে প্রত্যেক তাল-বিভাগে চারটি করিয়া মাত্রা আছে, এই হেতু ৪ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আকারটির ডাহিন পার্শ্বে যে ৩ সংখ্যা লিখিত আছে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—এক-এক-এক-এক; একদুই-একদুই-একদুই-একদুই; একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন; এইরূপ ভাবে সংখ্যা তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলে যে কালবিলম্ব হয় তদনুসারে তাল বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল নির্দ্ধারিত হয়। এক দুই তিন, এক দুই তিন, এইরূপ তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে যতটা সময় লাগে এই গানটির প্রত্যেক মাত্রা ততটা কালস্থায়ী, তাই ৩ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে, বিলম্ব, দ্রুত, অতিদ্রুত, প্রভৃতি আদেশ স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার আবশ্যক হয় না—কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত, ঐ সংখ্যার দ্বারা তাহা ঠিক্ ব্যক্ত হয়।

৬। যে স্বরগুলিতে গানের অক্ষর নাই—কেবল অক্ষরের টানটা চলিতেছে তাহাকে "আশ" বলে; এই টানের স্বরগুলি হাইফেন বা ক্ষুদ্র কসির দ্বারা যোগ করিয়া দিতে হয় যথা:—

। পা -ধা -ঞা ধর্সা।
। কি — — — ।

৭। আস্থায়ী হইতে পুনরাবৃত্তির সাধারণ চিহ্ন ॥ যুগল-ছেদ। অন্য স্থান হইতে পুনরাবৃত্তির বিশেষ চিহ্ন { } গুম্ফবন্ধনী। যেখানে এই } বিমুখী গুম্ফবন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া

দিতে হইবে ; ছাড়িয়া দিয়া, যেখানে এই { প্রমুখী বন্ধনী দেখিবে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যথা—এই গানের একাদশ ও শেষ পংক্তিতে "উদিয়াছে" ও "সাজে" এই কথা দুটির পরে যে } বিমুখী বন্ধনী আছে ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া চতুর্থ পংক্তিতে "বনমাঝে"র গোড়ায় যেখানে প্রমুখী { বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পুনরাবৃত্তি করিয়া কোথায় ছাড়িতে হইবে? যেখানে যুগল ছেদ আছে সেইখানে ছাড়িবে। ছাড়িয়া আবার আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কারণ, যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন।

৮। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া কোথায় ছাড়িয়া দিবে? যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ দেখিবে। শিরোদেশস্থ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে থামিবার কিম্বা ছাড়িয়া দিবার চিহ্ন। ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে কিম্বা একেবারেই ঐখানে থামিয়া যাইবে।

এই গানে কাওয়ালির ঝোঁক্ বরাবর সমান আছে—কিন্তু [illegible]মত কাওয়ালি তালের পদ বিভাগের নিয়ম রক্ষা করা হয় নাই—সুতরাং সম ফাঁকের ব্যবস্থা এই গানে দেখাইবার আবশ্যক নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ উপদেশ

দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, "পূর্ব্ব প্রবন্ধে একথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক।" দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোন ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনিনাংচ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয় মাত্র চন্দ্রনাথ বাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না। অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি, তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, চন্দ্রনাথ বাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথ বাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের মধ্যেও লোকে পরস্পর এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে! অতএব, চন্দ্রনাথ বাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দ্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই, যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক, এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথ বাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা, আকারে যদিও

বৃহৎ, কিন্তু তাহার মূল কথা ছুটি একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ "তাঁহারা বড় ভুল বুঝেন—তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা বা বিকৃতি বশতঃ আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ।" তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ "আত্মসম্প্রসারণ।" স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশঃ নির্গু[illegible] আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় মাত্র। অতএব পরা[illegible] সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম্ম পালন অত্যাবশ্যক। আব[illegible] যাঁহারা বলেন লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞান শিক্ষা সৌন্দর্য্য চর্চ্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থ-বিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়-প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিষ।" "বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।" "প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মানুষকে ব্রহ্মেই লইয়া দেয়।"

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথ বাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্ব্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ, বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার ... ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। ...বে হ্রাস হইয়া আর এক ভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সার্ব্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড় বড় অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্ম্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড় "বিরাট" অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনও প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণিতর পর্য্যায় আছে

কিন্তু "হাঁ"-কে বড় করিয়া "না" করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। "সৃষ্টিকৌশলের" মধ্যে "বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা" দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণ-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "লীলা" কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? "লীলা" কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? "সৃষ্টি-কৌশল" জিনিষটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোন যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেম-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালবাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশিস্বরে আহ্বান করিতেছেন—তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথ বাবু কি বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে "পাষণ্ড" বলিয়াছেন। সে যাহাই হোক্, সৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে

"মজাইতে" পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সে জন্য চন্দ্রনাথ বাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্ব্বোধ ছাত্র-বালকের মত নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোন কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কিরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম ?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্কিম বাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন—নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য্য কদর্য্য কিছুই নাই, এই জন্য তাঁহারা অতি কুৎসিৎবস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ, মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোন জাতিবিশেষের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে "বিরাটভাব" চর্চ্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের [illegible]রিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতঃই তিনি অকস্মাৎ [illegible]া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

লণ্ডনে।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি

যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘোরা গেল। ন্যাশ-নাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখ্‌-লুম। কোন ছবি পূরোপূরি ভাল লাগ্‌তে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্‌দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে' কোন কথা বল্‌তে পারিনে।

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে "গণ্ডোলিয়র্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। আলোকে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল্ একটা কোন্ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারিদিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে' কিন্নর লোক থেকে সৌন্দর্য্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। যেন, হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে' সুন্দর নর নারীর একটা উলট্-পালট্ ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সঙ্গীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়চে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্ব্বশ্রুত সুর পিয়ানোতে বাজা-চ্ছিলেন। শুনে আমার সেই গৃহ মনে পড়তে লাগ্‌ল! সেই

[illegible] বাহাদুর, [illegible]
[illegible] উচিত [illegible]
[illegible] পাওয়া যাবে [illegible]
[illegible] একটি [illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কিন্তু [illegible]
[illegible] এরকম [illegible]
[illegible]
[illegible] প্রথম [illegible]
[illegible] পরিবর্তন [illegible]
[illegible] মেয়েও এক [illegible]
[illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] হবে [illegible]
[illegible] এবং কিন্তু [illegible]
[illegible] করতেই হবে
[illegible] যদি না [illegible]
[illegible] চতুর্থ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] একটি [illegible]
[illegible] কিছু [illegible]
[illegible]

[illegible] আমরা কিছুই [illegible] থাকিতে। [illegible] এ পৃথিবীতে [illegible] কিন্তু [illegible]
আছে।

[illegible] বড় ভয়ে ভয়ে [illegible] কিছু [illegible] দিয়ে [illegible] উপস্থিত [illegible]

[illegible] "[illegible]" [illegible] দেখতে [illegible] বর্ষিবার [illegible] আছি। [illegible] মিশে [illegible] আছে। [illegible] চারিদিকে যেন কিছুক্ষণ [illegible] যৌবনের [illegible] পৃথিবী [illegible] ঢেউ [illegible] পড়ছে।

[illegible]

ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সঙ্গীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্ত্তা আমরা বহন করে' করে' বেড়াচ্ছি, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে' এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; "ভ্রম-ক্রমে" বলে' একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল, কিন্তু সেটা আমার মনে হল মৌখিক শিষ্টতা মাত্র। কিন্তু সন্তোষের বিষয়, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রা স্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র;—দেখে' পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগ্‌ত ত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। ঈফেল্ স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোন নীল-

নয়না পান্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক্ না কেন, তারো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাজনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাস কি দেখে'? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ—কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে' বল্‌তে পারি বিদ্রূপের তূলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে' হাসি পায় তাহলে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার্" বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলে' বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাঙ্গালা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেচেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেচেন "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এঁরা একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার আমাদের রাজকুল ইংরাজকুলও বটেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিষপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে আমরা খুব সমারোহের সহিত বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে' আমার বান্ধব অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, আমরা কোন বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দুজনে মিলে' জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই। আজ কাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করচি, যে, কাজের আর তিলমাত্র অবকাশ থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাইনে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হ'তেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে' থাকি। রাত দুটো বাজ্‌ল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্চে, কেবল আমাদের দুই হত-ভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটখাট এক্‌-জিবিশ্‌ন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। শুন্‌লুম, এটা প্যারিস্ এক-জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে' কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকররচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখ্‌লুম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথি-বীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই

দেখি, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখ্‌লে চেতনা হয় পশু মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে' রেখেচে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে' সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য আভাস দিয়ে দিলে। যবনিকার এক প্রান্ত তুলে ধরে' বল্লে, দেখ, দেখ, তোমরা কোন্ লক্ষ্মীকে অন্ধকারে নির্ব্বাসিত করে' রেখেছ! এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে সেই অসীমসুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য্য যে বড় সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা' বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারি দিব্য লাবণ্য এর সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে চকিতের মত মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্ব্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল!

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম্ নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট্ রচিত "ব্রাইড্ অফ্ লামারমুর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কি এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সুমুখবর্ত্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসেছিল।

তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁৎ সুন্দর ছোট মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুল্‌চে—বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজের আলো জ্বল্‌ছিল এবং সেই আলো ষ্টেজের অনতিদূরবর্ত্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুন্দর সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জ্জনা করবেন—অভিনয়কালে বারবার সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসঙ্কোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলো অভদ্র প্রথা আছে—যত কালই এদের সংসর্গে থাকি সেগুলো আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে না যায়! যেমন ঘূর্ণী নাচ—বিশেষতঃ ওয়াল্‌ট্‌জ্‌, মেয়েদের নাচবস্ত্র, পুরুষদের খাটো কুর্ত্তি, নাট্যশালার দূরবীন কষা, নিমন্ত্রণসভায় কাউকে গানবাজনায় প্রবৃত্ত করে' দিয়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে' এসেচেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক্ সব্‌জি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা' কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে'

বেড়ান। বড় বড় লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কিরকম করে' কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডি-নাল্ ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে' আসেন। ইতিমধ্যে একজিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে' এসেচেন এবং অবসরমত অ্যামেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করচেন। ভারত-বর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাঙ্গলা শিক্ষা করে' অনেক ভাল বাঙ্গলা বই গুজরাটিতে তর্জ্জমা করেচেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

পুরুৎ ঠাক্রুণ।

পুরুৎ ঠাকরুণ পাকা মাথায় সিন্দূর পরেন, বয়স তাঁর ষষ্ঠি বর্ষ। তা হলে কি হয়, এখনও পুরোহিত ঠাকুর হারাধন শর্ম্মার তিনি মরণ কাঠি জিয়ন্ কাঠি। শাঁখা বাজাইয়া, নথ দোলাইয়া ঠাকুরাণীটি যখন ঝঙ্কার করেন, তখন ঠাকুরটির হরিনাম ভুল হইয়া যায়, পরিণাম স্মরণ থাকে না, মনে হয় বুঝি বার্দ্ধক্যের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

পুত্রবধূ এবং কন্যাগণের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ শেষ হইয়া যায়। পট্টবস্ত্রপরিহিতা এবং চর্চ্চিতসিন্দূর শ্বেতসীমন্তিনী পুরোহিত ঠাকুরাণীটিকে অতি প্রত্যূষে ফুলের বাগানে বা বেলতলায় সাজি হাতে ঘুরিতে দেখিয়া সেকালের লোকের তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া মনে হইত।

একালের ঝি বউ কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার অন্যরকম নামকরণ করিয়াছে। শাশুড়ির একাদশীর দিন রায়েদের বউ যখন এইমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া খিড়কির ঘাটে মুখ ধুইতেছিলেন, পুরুৎ ঠাক্‌রুণ তখন সাজি হাতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। বউকে দেখিয়া ডানিহাতের সাজি বামে রাখিয়া ঠাকুরাণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাচ্ছিল্যে বলিয়া উঠিলেন—"একেই বলে কলির মেয়ে! বুড়ো শাশুড়ি একাদশী করে ঘরে পড়ে', বউ উঠ্‌লেন কিনা বেলা চার দণ্ডের সময়!" সেই দিন থেকে রায়েদের বউ পুরোহিতানীকে নাকি সমবয়স্কাদের কাছে অতি সঙ্গোপনে "পুরুৎ প্রেতিনী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। দুই দিন উপ্‌রি উপ্‌রি রাঁধিয়া চাটুয্যেদের সাধের মেজবউর ব্যামোহ হইয়াছিল—তাকে দেখিতে গিয়া ঠাক্‌রুণ বলিয়াছিলেন—"কি বাবুই হয়ে উঠ্‌লি তোরা? এই একটু অসুখ করেচে, এর জন্যে লোকে জানাজানি! আমর হলে মরে যেতুম!" সেই দিন হইতে মেজ বৌ তাঁর নাম দিয়া ছিলেন "পুরুৎ রাক্ষসী!" পরে যে রায়েদের বউতে আর মে বউতে বেগুণফুল পাতান হইয়াছিল সেটা এইরূপ মতের ঐ এবং প্রবল সহানুভূতির ফল।

ফুলের সাজি পূজার ঘরে রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঠা যখন কুট্‌নো কুট্‌তে বসেন, তখন তাঁর আর এক মূর্ত্তি। বুঝিয়া সে মূর্ত্তি বৈচিত্র্যময়ী। শাকসব্‌জি তরকারির অনটন সেদিন ভীমামূর্ত্তি, সম্মুখে প্রকাণ্ড বঁটি, হাতে ক ঘস্ ঘস্ শব্দ, মুখে পুত্রবধূদের এবং কখন কখন ক ত্রিকুলের শাখাপল্লবিত পরিচয়। তাই যারা ছেলে অসুখের জন্য পুরুত ঠাকুরাণীর কাছে উপদেশ এব

প্রার্থনা করিতে আসে, তাহারা কেহ প্রায় রিক্তহস্তে দেবীদর্শনে আসে না। কেহ আনে লাউ কুম্‌ড়ো পুঁইদাঁটা, কেহ বেগুণ কাঁচকলা থোড়। তখন অভয়া মূর্ত্তি, কেবল হাস্য এবং গল্পরস, এমন কি, অভয় পাইয়া নামাবলী গায় ঠাকুরটি যখন দাল-চালের খবর সুধাইতে আসেন তখন তাঁহাকে নথনাড়া সহিতে হয় না।

মূর্ত্তি ! প্রসন্নময়ী যখন ঠাকুরাণী শৌচাচার এবং জাতি-মহিমা ভুলিয়া যথার্থ দেবীর মত ছেলেদের, দুঃখীদের রোগ-শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসেন। রুগ্ন ছেলেটি বড় কাঁদিতেছে, মা পিসি কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারিতেছে না—পুরুৎ ঠাকুরাণী আসিয়া কোলে লইলে সে একেবারে চুপ। লোকে বলে বুড়ি কি মোহিনী জানে—আমি কিন্তু জানি বুড়ি অনেক ছেলে-ভুলানো গল্প জানে। বুড়ি যে জিলিপি মিঠাই সন্দেশের গাছের গল্প করে, ছেলেরা জানে তার মালী যদি কেউ থাকে ত সে পুরুৎ ঠাকরুণ ! এ বয়সে মিষ্টান্নের আর বড় ধার ধারি না, কিন্তু বুড়ির মিষ্ট মিষ্টি গল্পগুলি মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় আবার তমনি ছেলে বনিয়া যাই।

কত ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্রই জানা আছে এই পুরুৎ ঠাকরুণ-া। শুনা যায় তাঁর মন্ত্রঃপূত শর্ষপ তৈলের প্রলেপে সে লে চর্ম্মরোগ ত দেখা দেয়ই না—জলপড়ার মহিমায় পেঁচো মাম্‌দো প্রভৃতিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঔষধ করাও তাঁর ্ণ আসে। কিন্তু নাতী নাৎনী সম্বন্ধীয় দম্পতিগণের মিলন-দনে ঠাকুরাণীর কর্ণমর্দ্দন ও মুষ্টিযোগে যেরূপ অভ্রান্ত হস্ত তাতে ঔষধটা কতটা হস্তজ এবং কতটাই বা বলজ বয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। বাসর ্ৎ ঠানদিদির রঙ্গরস যে না দেখিল সে বুঝিতে পারিবে

না কেন ঠাকুরটি এখনও সে নথভূষিত বদনচন্দ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত। আর যে বর তাঁর পদ্মহস্তের স্পর্শসুখ কর্ণপল্লবে অনুভব করিয়া অশ্রুপাতের বদলে ওষ্ঠে এবং দন্তে হাস্যরস সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াছে, জনশ্রুতি এই যে তাহাকে "দোজবরে" হইতেই হইবে।

পুরুষ মহলেও পুরোহিতানীর পসার কম নহে। অনেকেরই তিনি ঠান্‌দিদি—কিন্তু নাতীগণ সহসা তাঁকে ঘাঁটাইতে রাজি নন্। তাহার প্রধান কারণ, বাজে কথা ঠাকুরাণীটির ঠাট্টা-তামাসার বিষয়ীভূত নহে। পণ্ডিতা না হইলেও তাঁর বিদ্রূপে একটা "নৈতিক লক্ষ্য" থাকিত—অনেক বেচালের চাল তিনি বাক্যকশাঘাতে সংযত করাইয়াছেন। নিষ্কর্ম্মা আমোদপ্রিয় গ্রাম্য যুবকদের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা ঠাকুরাণীদিদির ভয়ে তটস্থ। "অর্‌গুণ নেই বর্‌গুণ আছে" "বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" প্রভৃতি বাক্যবাণ তাঁর অমোঘ অস্ত্র—এবং লোকে বলে তিনিই তাহার রচয়িত্রী।

আতিথ্যে ঠাকুরাণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা। বারো মাস তাঁর সে জন্য আয়োজন। দৈনিক বরাদ্দ চাল দালের ভিতর থেকে তিনি গোপনে চারি মুষ্টি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। বাড়ির কুকুর বিড়ালকে পর্য্যন্ত আহার করাইয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস থাকিলেও মাসের মধ্যে বিশ দিন ঠাকুরাণীকে "ফলাহার" করিতে হয়। অভুক্ত অতিথিকে পানাহার দিতে তাঁর যে আনন্দ তার আর কি বলিব! তখন আর জাতিভেদ বড় থাকে না। শূদ্রকে পরিবেশন করিতে গিয়া বস্ত্র সম্বরণে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সাবধান হইলেও, মনটার মধ্যে কোন ভেদাভেদ কেহ কখন লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

পাল পার্ব্বণে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি আরও বিকশিত হইয়া উঠে। পৌষ পার্ব্বণে পিঠে পুলির দিনে পুরুৎবাড়িতে যে প্রসাদ পাইল না তাহার বৃথা জন্ম। তখন বিচিত্র আলিপানার রঞ্জিত সুঠাম আঙ্গিনায় ঠাকুরাণীকে সহস্রবার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া মনে হয় লক্ষ্মীর পদরেণু ধারণের জন্যই এ চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি বটে।

পুরুৎঠাক্রুণকে বৌ ঝি প্রণাম করিলেই তিনি স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করেন "আমার মত পাকা মাথায় সিন্দূর পর বাছা!" এ কলিকালে কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ বড় ফলে না।

সাহিত্যের প্রাণ।

একটি মাত্র গাছকে প্রকৃতি বলা যায় না। তেমনি কোন এক্টি মাত্র বর্ণনাকে যদি সাহিত্য বলে' ধর তা হলে আমার কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণনা সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নেই কিন্তু তার দ্বারা সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একটি মাত্র সূর্য্যাস্ত বর্ণনার মধ্যে লেখকের জীবনাংশ এত অল্প থাক্‌তে পারে, যে, হয় ত সেটুকু বোধগম্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু উপরি-উপরি অনেকগুলি বর্ণনা দেখ্‌লে লেখকের মর্ম্মগত ভাবটুকু আমরা ধরতে পারতুম। আমরা বুঝ্‌তে পারতুম লেখক বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মার সংস্রব দেখেন কি না; প্রকৃতিকে তিনি মানব-সংসারের চারিপার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালের ছবির মত দেখেন, না, মানবসংসারকে এই প্রকাণ্ড রহস্যময়ী প্রকৃতির একান্তবর্ত্তীস্বরূপ দেখেন, কিম্বা মানবের সহিত প্রকৃতি মিলিত হয়ে, প্রাত্যহিক সহস্র নিকটসম্পর্কে বদ্ধ হয়ে, তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য দৃশ্য উপস্থিত করে।

সেই তত্ত্বটুকুকে জানানই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য তা' নয়, কিন্তু সে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের উপর কার্য্য করে—কখনো বেশি সুখ দেয়, কখনো অল্প সুখ দেয়; কখন মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখন বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে তা' নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখন ম্লান শ্রান্তির ভাবে, কখন গভীর শান্তির ভাবে, স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত করে' তোলে। নতুবা, তুমি যে-রকম বর্ণনার কথা বলেছ সেরকম বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। ভাষা কখনই রেখাবর্ণময় চিত্রের মত অমিশ্র অবিকল প্রতিরূপ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, যেমন-তেমন লেখকের যেমন-তেমন বিশেষত্বই যে আমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি তা নয়। মনে কর, পথ দিয়ে মস্ত একটা উৎসবের যাত্রা চলেচে। আমার এক বন্ধুর বারান্দা থেকে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখ্‌তে পাই, আর এক বন্ধুর বারান্দা থেকে বৃহৎ অংশ এবং প্রধান অংশ দেখ্‌তে পাই—আর এক বন্ধু আছেন তাঁর দোতালায় উঠে যে দিক থেকেই দেখ্‌তে চেষ্টা করি কেবল তাঁর নিজের বারান্দাটুকুই দেখি। প্রত্যেক লোক আপন আপন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের এক একটা দৃশ্য দেখ্‌চে—কেউ বা বৃহৎভাবে দেখ্‌চে, কেউবা কেবল আপনাকেই দেখ্‌চে। যে আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখাতে পারে না সাহিত্যের পক্ষে সে বাতায়নহীন অন্ধকার কারাগার মাত্র।

কিন্তু এ উপমায় আমার কথাটা পূরো বলা হল না, এবং

ঠিকটি বলা হল না। আমার প্রধান কথাটা এই—সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্চে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্য্যাস্তকে তিন রকম ভাবে দেখা যাক্। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত, চিত্রের সূর্য্যাস্ত, এবং সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত হচ্চে, নিছক্ সূর্য্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্য্যাস্ত হচ্চে কেবল সূর্য্যের অন্তর্ধানমাত্র নয়, জলস্থলআকাশমেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে' সূর্য্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত হচ্চে সেই জলস্থল-আকাশমেঘের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে' দেখা; কেবলমাত্র সূর্য্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্ম্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে' প্রকাশ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে' একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; তেম্নি জগতের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা দান করে' একটা নূতন কাণ্ড করে' তুলি; অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অমর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি; এবং তখনি সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত সর্ব্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকল প্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কার-রূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্ম্মল করে' দেখাতে পারে।

সুইজর্‌ল্যাণ্ডের শৈলসরোবর-সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বল্‌তে পার সেখানকার উদয়াস্ত কিরকম অনির্ব্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেইরকম আছে। বড় বড় লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিষকে এমন করে' প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দ্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে' দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কুণো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' না ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আপনার জীবনের দশদিক্ উন্মুক্ত করে' নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে' নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বা'র করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘরগড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করচে সেটি হচ্চে লেখকের মর্ম্মস্থান—অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তার একটা বিশেষত্ব খুঁজে বা'র করা কঠিন এই জন্যে, যে,

তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে' তুলেচেন তাকে দুটি চারটি সুসংলগ্ন মত-পাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এই জন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।

কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে—কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মত অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই; সাক্ষাৎ ভাবে, বা পরোক্ষ ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মত।

কিন্তু, এই হাসি কান্না অনুরাগ বিরাগ কোথা থেকে উঠ্‌চে! ফল্‌ষ্টাফ্ ও ডগ্‌বেরি থেকে আরম্ভ করে' লিয়র্ ও হ্যাম্‌লেট্ পর্য্যন্ত শেক্সপিয়র্ যে মানবলোক সৃষ্টি করেচেন, সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসিঅশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারো অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা এবং খুচ্‌রো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপিয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েচে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে শেক্সপিয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি নভেল যতই চিত্রবিচিত্র করে' রচিত হোক্, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক্, শেক্সপিয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাই

নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেক্সপিয়রে বর্ণিত প্রতিদিনদুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্সপিয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্য্যন্ত আলোড়িত করে' শেক্সপিয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে' দিয়েচেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্চে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে' কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করচে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মত অবাধে ঝরে' আস্‌চে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মত প্রমোদে ফেটে পড়চে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গেটিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্চে ঠিক এর বিপরীত। গেটিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেচেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখ্‌তে পাইনে। যে সৌন্দর্য্য মানুষের ভালবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য্য ভালবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্য্যকে অবারিত করে' দেয়—মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্য্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠ্‌চে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে' তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক্ ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এই জন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ,

সেটা একরকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই। অতএব, মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে, সাহিত্যের সত্য ততটা বেশি বেড়ে যাবে।

কিন্তু অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে সেটা হচ্চে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হল, এবং যথাযথ হলেই সত্য হল।

এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্চে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য?

জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্চে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজ্‌মের মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজ্‌মকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্চে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্চে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেক্সপিয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করিনে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েচে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা

স্বীকার্য্য, যে, প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাক্‌লেও সাহিত্য হয় কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ কিন্তু বীজ গাছ নয়।

আমার পূর্ব্বপত্রে এ কথাটাকে বোধ হয় তেমন আমল দিই নি। তোমার প্রতিবাদেই আমার সমস্ত কথা ক্রমে একটা আকার ধারণ করে' দেখা দিচ্চে।

কিন্তু যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুক্‌রো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল, এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে' দেখ, তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হূহূ করে' চলে যাচ্চে; তার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাক্‌চে না কেবল সাহিত্যে থাক্‌চে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্ব্বের সহিত রক্ষা করে।

আমার এক একবার আশঙ্কা হচ্চে তুমি আমার উপর চটে' উঠবে—বল্‌বে, লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না। আমি বাড়িয়ে কমিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল নিজের মতটাকে নানা রকম করে' বল্‌বার চেষ্টা করচি; প্রত্যেক পুনরুক্তিতে পূর্ব্বের কথা কতকটা সম্মার্জ্জন পরিবর্ত্তন করে' চলা

যাচ্চে—তাতে তর্কের লক্ষ্য স্থির রাখা তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্চে। কিন্তু তুমি পূর্ব্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠ্‌তে পারলে আমি জোর পাইনে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন করচ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্চে।—তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোন একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়—অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্ত্তে হাইরোগ্লিফিক্স্‌ ব্যবহারের মত। কিন্তু এরকম রচনা-প্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে' প্রতিনিধি দ্বারা ব্যক্ত করা। এ রকম করলে যুক্তিসংসারের আদানপ্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক্‌, আগে থাক্‌তে দোষ স্বীকার করচি তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

তুমি লিখেচ, আমার সঙ্গে এ তর্ক তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও। তা হলে আমার পক্ষে ভারি মুস্কিল। তা হলে কেবল টুক্‌রো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে' যায় কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি? এই জন্যে তর্ক উপস্থিত হলে বিনা নুটিশে অকস্মাৎ কাউকে ডাক্‌ দিয়ে

সাম্‌নে তলব করতে পারিনে—নামও জানিনে, চেহারাও চিনিও নে। লেখবার একটা সুবিধে এই যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়, লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে' যাওয়া যায়—নিজের সঙ্গে নিজের নূতন পরিচয়ে প্রতি পদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে। সেই নূতন আনন্দের আবেগে লেখা অনেক সময় জীবন্ত ও সরস হয়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও আছে। কাঁচা পরিচয়ে পাকা কথা বলা যায় না। তেমন চেপে ধরলে ক্রমে কথার একটু আধটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। চিঠিতে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্ত্তন করবার সুবিধা আছে। প্রতিবাদীর মুখের সাম্‌নে মতিস্থির থাকে না এবং অত্যন্ত জিদ্ বেড়ে যায়। অতএব মুখোমুখী না করে' কলমে কলমেই ভাল।

ধর্ম্মজঙ্গল।

নব্য হিন্দুর এক প্রধান সমস্যা ধর্ম্ম। এক দিকে পুরাতন শাস্ত্রবিধি—নানা মুনির নানা মত, নানা গুরুর নানান্ টীকা, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নানা সময়ের স্তূপাকার বিধি এবং বিধানের দুর্ভেদ্য রহস্য; একদিকে প্রচলিত লোকাচার—হিঁদুয়ানির সহস্র নির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান, খাওয়া পরা শোওয়া বসা, ওঠা নামা, হাঁচি কাশির বিবিধ উপদ্রব; আর একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন জ্ঞানালোকে নূতন ভাব, নূতন বিশ্বাস এবং নূতন কর্ত্তব্যের উত্তেজনা। এই তিনের

মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করা মহা দায়। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেয়, লোকাচার আবার স্বতন্ত্র বিধান জারি করে, এবং ইংরাজী শিক্ষা যে পথ নির্দ্দেশ করে তাহা অনেক সময়েই লোকাচারের বিশেষ বিরোধী এবং শাস্ত্রকেও যে সর্ব্বত্র সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলে এমন বলা যায় না। সুতরাং নব্য হিন্দুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শিক্ষাগুণে তিনি পাশ্চাত্য ভাবে দীক্ষিত, সমাজের ভয়ে লোকাচার পালন করেন এবং তর্কস্থলে কেবল আর্য্যমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য জানাশুনা বচন পাইলে তাহা লইয়া সঘনে মুখনাড়া দেন। কতটুকু কি মানিলে এবং কতটুকু কি করিলে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ পালন করা হয় এবিষয়ে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ড বিধর্ম্মীরই মত।

সে জন্য কিন্তু নব্য হিন্দুকে দোষ দেওয়া চলে না। কি করিলে না করিলে হিন্দুধর্ম্ম পালন কিম্বা লঙ্ঘন করা হয় বলা বাস্তবিকই বড় শক্ত। মুসলমান কিম্বা খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে কতকগুলি মূল বীজে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করাই মুসলমান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র; যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করার উপরেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসের এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি নাই। নানাবিধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিরোধী মত ও বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, কাব্য দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল যাহা কিছু কোন কালে এদেশে উদ্ভূত হইয়াছে কিম্বা বিদেশ হইতে আসিয়া কালক্রমে এদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই নিঃশব্দে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার

কতটা বিশেষ কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস, কতটা লোকাচার, কতটা শাস্ত্রপালন, কতটা জাতিভেদ আহার বিহার সম্বন্ধে সমাজের নিয়মরক্ষা, আর কতটাই বা ব্যক্তির স্বাধীনতা এ পর্য্যন্ত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে ত তাহা কেবল কোনপ্রকার শৃঙ্খলা, প্রণালী এবং গঠনের সম্পূর্ণ অভাব। জ্ঞানে অজ্ঞানে, সত্য মিথ্যায়, ব্রহ্মে মৃৎপিণ্ডে, দেবতা পিশাচে, প্রেমে হিংসায় এরূপ নির্ব্বিবাদ একান্নবর্ত্তিতা আর কোথাও দেখা যায় না। আস্তিক্য এবং নিরীশ্বরবাদ, বিশ্বাস এবং সন্দেহ, কর্ম্ম এবং আলস্যের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। চার্ব্বাকের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ঈশ্বর ও পরকাল হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে ব্যক্তি সমস্ত ধর্ম্মনীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে সেও যেমন হিন্দু, আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম না লইয়া জলগ্রহণ করে না সেও সেইরূপ হিন্দু। ব্রহ্ম যাহার আরাধ্য দেবতা এবং তেত্রিশ কোটি উপ ও অপদেবতা যাহার সম্বল দুই জনেই হিন্দুধর্ম্মের সমান সেবক। বিধানও তেমনি;—একদিকে অহিংসার পর ধর্ম্ম নাই, আর একদিকে বলি নহিলে দেবপূজা হয় না—বলি ছাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ অবধি। সুতরাং কি যে হিন্দু-ধর্ম্মের অনুমোদিত এবং কি নয় তাহা ঠাহরান দায়। ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে হয়, কাহাকে হিন্দু নয় বলিলে লাইবেল এবং কাহাকে হিন্দু বলিলে লাইবেল হইয়া দাঁড়ায়।

অধিকারীভেদের ব্যবস্থা এখানে খাটে না। অর্থাৎ এ কথা বলা চলে না যে, হিন্দুধর্ম্মের একটি মূল মত ও বিশ্বাস আছে—তবে সর্ব্বসাধারণে সে উচ্চ ভাব সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না বলিয়া নানা দিক দিয়া সেই আদর্শে লইয়া যাওয়া হয়।

দুই সম্পূর্ণ বিরোধী মতের গতি বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে। নিরীশ্বরবাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নহে এবং দেবোদ্দেশে ক্রমাগত জীবহিংসা করিয়া অহিংসা সাধন হয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট মূল মত বা বিশ্বাস নাই। ঋষিরা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন—তাঁহারা সেই সকল চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন, বলপূর্ব্বক সব ঋষিকে এক গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরাও তখনকার সুবিধামত যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন যাবতীয় প্রাচীন ঋষিবাক্যের সহিত তাহার ঐক্য হইবার কথা নয়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনো কিছু ছিল না—এবং পরে পরে পাঁচ জনে সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ব্যাখ্যাও করেন নাই।

কেবলি যে কোনও মূল ধর্ম্মমত কিম্বা বিশ্বাসের কোনরূপ আঁটাআঁটি নাই তাহা নয়, আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ মাংসাশী, পশ্চিমী ব্রাহ্মণের আমিষসংস্পর্শ নিষিদ্ধ এবং এ নিষেধ অবহেলা করিলে অবিলম্বে জাতিচ্যুত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণ পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গলার শক্তিউপাসকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের পানদোষদৃষ্টান্তও বিরল নহে, কিন্তু পলাণ্ডুভক্ষণ কিম্বা মদ্যপানে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সদ্য জাতিনাশ হয়। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দাম্পত্য ছিন্ন করিয়া পত্যন্তরগ্রহণও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন নানা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান—কোনটির সহিত কোনটির বড় মিল নাই। এ সকল আচার-

ভেদকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ, এই আচারভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে আহারব্যবহার আদান-প্রদান সম্বন্ধে যত বাধা এবং সকল প্রকার আত্মীয়তার পথ একেবারে বন্ধ।

কিন্তু আদানপ্রদানের পথ বন্ধ কেবলি কি আচারভেদ নিবন্ধন? না, জ্ঞাতিবৈরী, গ্রাম্য দলাদলি এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে? রাঢ়ী বারেন্দ্র, কুলীন বংশজ, ফুলমেল হেন-তেন এ সকলেও ত আমাদিগকে পরস্পর হইতে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা এ দেশের মাটির গুণ বলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম একদিকে যেমন ঢিলেঢালা আল্গা—মত ও বিশ্বাসের বাঁধাবাঁধি নাই, বিরোধী অনুশাসন এবং আইনকানুনের মধ্যে ভেদাভেদ নাই, কেবলি শাস্ত্রে অশাস্ত্রে লোকাচারে অনাচারে গোঁজামিল; আর একদিকে তেমনি বজ্রআঁটুনি, স্তরে স্তরে নানারকমের জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, কুলে কুলে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। মুসলমান অথবা খৃষ্টান ধর্ম্ম যেমন বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে এক বৃহৎ মণ্ডলীর মধ্যে আনিয়া এক করিয়া ফেলিতে চায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মণ্ডলীগঠন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ভেদবুদ্ধি ইহার স্বাভাবিক।

প্রচার ত হিন্দুধর্ম্মের ভাব নয়, সুতরাং মণ্ডলীগঠনের আমাদের আবশ্যকও হয় নাই। আর দেশব্যাপী সুবৃহৎ এক ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপনের পক্ষে আমাদের কতকগুলি বাধাও ছিল। ভারতবর্ষ চিরদিনই সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগ অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিত্য ঝগড়া

বিবাদ যুদ্ধহাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। এ অবস্থায় একটা রীতিমত ধর্ম্মগঠন অসম্ভব। তবে এখন যে আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া পড়িয়াছি সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া—ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে সকল বিষয়ে যে একটি প্রণালীবদ্ধ বৃহৎ সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে প্রাচীনকালের সমাজ ও ধর্ম্মে এই ভাব আরোপ করিয়া একটি মানসী প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলিতেছি মাত্র। এবং নব্য হিন্দুধর্ম্মকে এই মানসী প্রাচীনেরই বংশধর ঠাহরাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যেন সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ধর্ম্ম, এক-মত, এক-বিশ্বাস—এবং এই বিপুল জনসমাজ যে ধর্ম্মবন্ধনে পরিচালিত তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত আমাদের যাহা কিছু ঐক্য ঐ যাবনিক হিন্দু নামটায়। হিন্দু বলিলে আমরা প্রথমতঃ ভারতবাসী বলিয়া বুঝি, দ্বিতীয়তঃ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী নয় বলিয়া জানি, তৃতীয়তঃ পিতামাতা যে হিন্দু তাহার পরিচয় পাই। মনের এক কোণে জাতিভেদের একটু ছায়াও আসিয়া পড়ে। এবং ব্রাহ্মণ্যের সহস্র বিরোধী বিধানের মধ্যে যে কোন গুটিকতকের প্রভাব অনুমান করি। কিন্তু জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে প্রাচীনকালে মধ্যে মধ্যে যে সকল ধর্ম্মান্দোলন গিয়াছে তাহাও এখন হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চৈতন্য প্রভৃতি সংস্কারকেরা অবতারের মত সম্মানিত হয়েন। এমন কি, যে বুদ্ধদেবের প্রভাবে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মণ্য একেবারে নির্ব্বিষ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত জাত্যভিমান ও মিথ্যা দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল সে বুদ্ধদেবও আমাদের একজন অবতার মধ্যে গণ্য। শুধু তাই

নয়। জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে উচ্চনীচে ভেদ নাই—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছায়া মাড়াইয়া স্নান না করিলে আপনাকে পতিত বলিয়া ঠিক দিয়া রাখেন, শূদ্রের অন্নগ্রহণ করিয়াও সেখানে তাঁহার ব্রহ্মণ্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

এ সকল ছিদ্র থাকিলেও কিন্তু জাতিভেদ যে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একজন মহৎ লোকের আবির্ভাবে চারিদিকে যথন একটু উৎসাহ উদ্যমের সঞ্চার হয় তথনই দিনকতক এথানে জাতি ভাঙ্গে সেথানে শ্রেণী ভাঙ্গে, একটা হৈচৈ বাধে, তাহার পর আবার যে-কে-সেই। বুদ্ধই আস্থন আর চৈতন্যই আস্থন চোথের আড়াল হইলেই আমাদের প্রাণের আড়াল। আমাদের যাহা কিছু সম্পর্ক শরীরী মানুষটির সহিত, আমরা ভাবের ধার ধারি না। তাই মহত্বকে কেবল অবতার হিসাবে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করি এবং কার্য্যতঃ যথাসাধ্য তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে ত্রুটি করি না। চৈতন্যের শিষ্যেরা তাঁহার অনুসরণ করে তাঁহাকে মারিয়া—তিনি যে সার্ব্বজনীন উদার প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন সেই প্রেম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ করিয়া, তিনি যে মধুর রসে জগতের হৃদয় সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই বিমল রসে বিষ মিশাইয়া। বুদ্ধ অবতারীকৃত—কিন্তু যে মহদ্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সে ভাবকে আমরা দেশান্তরিত করিয়া নিশ্চিন্ত। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবতার বলিয়া গণ্য করিলেও বুদ্ধকে আমরা নাস্তিক বলিয়া গালি দিতে ছাড়ি না। এরূপ দেবে দানবে—অবতারে নিরীশ্বরে অপূর্ব্ব সম্মিলন একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব।

আসল কথা, ভেদসংঘটন আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি

বিশেষ লক্ষণ। এবং সেই জন্যই জাতিভেদ আমাদের ধর্ম্মের সহিত এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে রক্তচলাচল বন্ধ। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দিকে আমাদের যত ঝোঁক। দেবতা তেত্রিশ কোটি এবং ইহার উপরে প্রতিদিন দু' দশটি করিয়া বাড়িতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেবকদিগের মধ্যে দলাদলি। শৈব বৈষ্ণব দেবতার নামে ছড়া বাঁধিয়া গালি দেয়, বৈষ্ণব খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবের যত অপকর্ম্ম বাহির করে, আবার শাক্ত শৈবের মধ্যেও বনিবনাও হয় না। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, স্ত্রীদেবতার প্রতি ধনপতি সওদাগরের বিরাগের কথা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আবার ছোটখাট অনেক অজ্ঞাতকুলশীল দেবতা আছেন, ভক্তেরা স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এবং এরূপ অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দেখা যায় যে, মনস্কামনা সিদ্ধিপক্ষে সত্যপীর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনসা দেবী অনায়াসে মহেশ্বরকে লঙ্ঘন করিয়া যাহাকে তাহাকে কালিন্দীসহোদরসদনে চালান দিতে পারেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন জাগ্রত দেবতার পরিচয় শুনা যায়। গ্রামের লোকেরা অনেক বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করে। ও-পাড়ায় মনু বুড়ী এতদিন বাঁচিয়া বাঁচিয়া একানব্বই বৎসর বয়সে যেই ইহলীলা সাঙ্গ করিল, বৎসর না যাইতে এ-পাড়ার নবীন ঘোষের গৃহিণী পুত্রশোকের মর্ম্মঘাতী বেদনা অনুভব করিলেন; লোকে সন্ধান পাইল মনু বুড়ী নিতান্ত যে-সে নয়, নবীন ঘোষের বাড়ীর ঈশান কোণে আমড়াতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমড়াবনের পাশে পুকুরপাড়ে ওলাদেবীর বাস, মনু ওলাদেবীর কেহ হয়।

অতএব ওলাদেবীর মত মনু বুড়ীরও সেবার বিধানাদি করিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। এইরূপে মনুঠাকুরাণী ওলা মনসার দল বৃদ্ধি করিলেন। জেনেরাল নিকলসন সিপাহী-দের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন—তাহারা তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। আর সন্ন্যাসী ফকির মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি ত নিত্য ঘটনা। এইরূপে পুরাতন ও নূতন দেবদেবীতে আর স্থান সং-কুলান হয় না। দেবতাদিগের মধ্যেও নানা জাতি এবং বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, এমন কি, কদাচ কখনো মুসলমান এবং খৃষ্টান পর্য্যন্ত। এইখানে বলা ভাল, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুরূপী দেবতারও মধ্যে মধ্যে নাম শুনা যায়। এবং অনেক সময় ভূতপ্রেত হইতে এই সকল দেবতার অভিব্যক্তি।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল সময় এই সকল দেবতাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন তাহা নয়—দেবতার আবির্ভাব কখন্ কোথায় হয় বলা ত যায় না—তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তা' ভূতো বাগ্দীই কে জানে আর হারু চণ্ডালই বা কে জানে! তবে ঘণ্টা নাড়িবার বেলায় একটা ব্রাহ্মণ চাই বটে। কারণ, শূদ্রসংস্পর্শে দেবতার দেবত্বনাশ হইতে আটক নাই। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ জুটিতে বিলম্ব হয় না। এবং ঘণ্টানাড়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরাও এই অনার্য্য দেবতার চরণে ফুলচন্দন ও একটি করিয়া প্রণাম পাঠাইয়া ধন্য হয়েন।

অনার্য্য দেবতা বলিলাম বলিয়া এখানে হয়ত কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, হিন্দুধর্ম্মকে অনেকে সম্পূর্ণ আর্য্য বলিয়া মনে করেন এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত ইহাকে এক ঠাহ-রান। কিন্তু হিন্দু এবং আর্য্যে অনেক তফাৎ। আর্য্য বলিতে কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীকেই বুঝায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য;

হিন্দু আর্য্যে অনার্য্যে, উচ্চ নীচে, নানা বিরোধী জিনিষের সম্মিশ্রণের ফল। হিন্দু কেবলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে আবদ্ধ নয়, হাড়ি বাগ্‌দী ডোম চামার ভারতের অধিবাসী যে কেহ স্পষ্টতঃ মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান নয় সেই হিন্দু। এবং ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হইলেও হিন্দুধর্ম্মগঠনে এই সকল নানাবিধ নিরক্ষর লোকদিগের কল্পনার কম প্রভাব নহে। এবং সে প্রভাব উন্নত ব্রাহ্মণদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। মাঝিমাল্লারা বিপদ্ নিবারণের জন্য বিশালাক্ষির দহে পয়সা ফেলিয়া দেয়। দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও নৌকা করিয়া যাইবার সময় উক্ত স্থানে বিশালাক্ষি দেবীর উদ্দেশে তাম্রমুদ্রা নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছেন এবং শূন্যে প্রণাম ঠুকিয়া মনে মনে বলেন, হে মা বিশালাক্ষি, এ যাত্রা রক্ষা কর, যেন বাড়ী গিয়া গৃহিণীর মুখচন্দ্র দেখিতে পাই, আবার যখন এখান দিয়া যাইব তোমার জন্য আবার এমনি করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিব। মুসলমানের দেখাদেখি অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণেরা সিন্নি দিয়া পীরকে সন্তুষ্ট রাখেন। এ সকল দেবতা উপদেবতা যে ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রসূত নহে তাহা ত আর চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে হইবে না। এবং ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মগঠনে নিম্নশ্রেণীর প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সংহত ধর্ম্মগঠনে এক করিতে চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা আপনমনে ধ্যানধারণা করিতেন এবং আপন উন্নত আদর্শে আপনাকে গঠিত করিতেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে আদর্শে কখনও পৌঁছে নাই, এবং সাধারণের পক্ষে সে আদর্শ দুর্গম বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণকে সে বিষয়ে উপদেশও দিতেন না। জ্ঞানধর্ম্মে অগ্র-

সর বলিয়া সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের সহিত সর্ব্বত্র যোগ রক্ষা করিতে পারিল না, তখন সহস্র প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া বংশগুণে ব্রাহ্মণই সেইসকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রভাব। নহিলে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম সাধারণ্যে কখনও প্রচলিত হয় নাই—এবং ব্রাহ্মণের প্রভাব ঠিক খৃষ্টান পাদ্রীর মত নহে। বংশগৌরবে দেবত্বের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এবং ইহা হইতেই তাঁহার অমর প্রভাব।

কিন্তু এ কথা মানিতে হয় যে, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের মূল ব্রাহ্মণ। এবং সাধারণের প্রভাব যেমন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়াছে ব্রাহ্মণের প্রভাব তেমনি সাধারণের ধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে গঠন দিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যোগ ঠিক কোন্‌খানটায় এবং বিচ্ছেদই বা কোথায় এখন নির্ণয় করা কঠিন। কালসহকারে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নিঃশব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে এবং প্রচলিত সহস্র সংস্কার আত্মসাৎ ও পরিপুষ্ট করে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে নামিয়া আসিয়া সাধারণের উপযোগী অনেক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এবং সে সকল বিধি ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজের উপরেও ফলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম সকলই;—ব্রাহ্মণেতর নানাবিধ উপধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের সম্মিশ্রণ হিন্দুধর্ম্ম; অমিশ্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম; এবং যে সকল অপধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের ছায়াও মাড়ায় নাই তাহাও

হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে রেখা টানা চলে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি কি, তাহা এতক্ষণে বোধ করি কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এবং কোনপ্রকার শৃঙ্খলার যে এখানে কিরূপ অভাব তাহা বুঝিতেও কাহারো বড় বাকি নাই। হিন্দু দেবচরিত্র আলোচনা করিলে এ অভাব আরও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। তেত্রিশ কোটির অধিক দেবতা হইলেও একই দেবচরিত্রের এরূপ অসঙ্গত বিরোধী বর্ণনা দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এবং একই দেবতার নানা বিরোধী উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার নৈতিক একতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এক কৃষ্ণকে কতজনে কতভাবে দেখে—কেহ রূপকহিসাবে, কেহ অবতারহিসাবে, কেহ পূর্ণব্রহ্মহিসাবে, কেহ আদর্শ মনুষ্যহিসাবে; এবং এই হিসাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। কৃষ্ণলীলা যাহারা কেবলমাত্র রূপকহিসাবে গ্রহণ করে এবং যাহারা ইহার পার্থিব অনুকরণকেই মুক্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে নীতিবিষয়ে ঐক্য হইবার কথাও নয়। কৃষ্ণের নামের চারিদিকে নানা রসের গল্প জুটিয়াছে—এই সকল গল্পের নায়করূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের নীতি গঠন করেন। মহাদেবও একদিকে অসাধারণ সংযমী যোগীপুরুষ—ভোগসুখের মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ; অন্যত্র নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া এবং কুচনীপাড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এক মহাদেবের দুইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক প্রভাব। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উভয় ভাবে এই সকল দেবচরিত্রের কিরূপ প্রভাব যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন,

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন। আর মিথ্যাচরণে কাপট্যাবলম্বনে এবং যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের দেবগণ কিরূপ পটু তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইলে সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান এবং অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত রাশীকৃত গ্রন্থের উপর নিশ্চিন্ত মনে বরাত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত দেব-চরিত্র চরিত্রহীনতার আদর্শ। এবং নবাবী যথেচ্ছাচারিতাই দেবতাদিগের ক্ষমতার একমাত্র পরিচয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি যতই সংযম সাধনের উপদেশ দিয়া মরুক্ না কেন, এইসকল প্রবল আদর্শ আমাদিগকে সংযমসাধনের পথ হইতে নিরাপদ দূরে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের এইরূপ বহুরূপী বিশৃঙ্খলা বোধ করি অনেকাংশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের সহিত জড়িত। এক বৃহৎ সংহত শাসনতন্ত্রের অধীনে সমস্ত দেশ যখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিবার অবসর পায় তখনই প্রায় ধর্ম্ম লইয়া জাতির হৃদয়ে একটা আন্দোলন উঠে এবং সুবৃহৎ সংহত ধর্ম্ম-গঠনের এই সময়। নহিলে, চতুর্দ্দিকের অশান্তি উপদ্রবে লোকের মন যখন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকে তখন সুশৃঙ্খলে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত জাতীয় ধর্ম্মসংগঠনের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ প্রথম দৃষ্টিতে কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার অনুকূলে যখন রীতিমত ঐতি-হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আর এ যোগ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজনৈতিক অশান্তির সহিত রোমের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থাও বিশৃঙ্খল ছিল—আমাদেরই

মত নানা দেবতা উপদেবতা, কোনটির সহিত কোনটির বড় ঐক্য নাই, রোমানেরা মনের নানা প্রবৃত্তিকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিত, ভাল মন্দ বিচার ছিল না, স্বর্গ নরক গায়ে গায়ে, মুড়ি মিছরি একদর। রাজনৈতিক শান্তি এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মগঠন প্রায় একসঙ্গেই আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইংরাজশাসনের শান্তিতে জাতীয় ধর্ম্মগঠনের ভাবের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছে। এবং প্রাচীনকালেও আমাদের অদৃষ্টে একবার এই শুভ অবসর জুটিয়াছিল। অশোক তখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—তাঁহার প্রবল প্রতাপে সমস্ত ভারত এক-ছত্র। রাজনৈতিক অবস্থা শান্তিময় এবং জাতীয় ধর্ম্মগঠনের অনুকূল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম এবং অশোক একজন পরম বৌদ্ধ। অল্পদিন মধ্যে হুহু করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া আমাদের মজ্জার মধ্যে বসে নাই—বসিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষ বহু-দিন একছত্র রহিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল। শিথিল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বৌদ্ধ আন্দোলনের বৃহৎ সংহত সুশৃঙ্খলা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার ছোটখাট রাজ্য উপ-রাজ্য এবং অনির্দ্দিষ্ট সহস্র বিশ্বাস উপবিশ্বাসের অরাজকতায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

এই অরাজক অবসরে চারিদিক হইতে যে নূতন বহুরূপী ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল তাহাই এই নব্য হিন্দুধর্ম্মের জননী। এবং সেই অবধি হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল—যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে নানা রকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা—কোথাও পথ দেখা যায় না—এবং এতদিন পথের সন্ধানও কেহ

করে নাই। সূর্য্যালোক নাই—দিক্‌নির্ণয়শলাকা নাই—ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে ইহাদ্বারাই যদি কালে এই বিপুল ধর্ম্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়—এবং এই ঘন নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয়—সেই একমাত্র ভরসা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

হিন্দুর এ হীন গৃহ চির স্বর্গময়
হিন্দু রমণীর যেই নিষ্কাম জীবনে,
আজীবন পালে হেথা রমণীহৃদয়
যে নিত্য সাবিত্রী-ব্রত পতির চরণে,
কবিতার আদি গুরু অমর ভাষায়
যে পরম নারীধর্ম্ম শুনাল ধরায়,
সেই অমৃতের ছবি আঁকি পুনরায়
ঘরে ঘরে ও লেখনী অমৃত বিলায়;
বিষবৃক্ষ মাঝে চির অমৃতবল্লরী
তোমার ও সূর্য্যমুখী যেন মূর্ত্তিমতী
পতিসেবা, কায়মনে বিক্রীত কিঙ্করী
পতিদেব-দেবালয়ে, পতি মুক্তি গতি;
পতি- ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে পতি-সন্ন্যাসিনী
পবিত্র এ গৃহাশ্রমে হিন্দুর রমণী।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সচেতন ও অচেতন আত্মা।

শরীর ও মনের পরস্পরের সহিত যোগাযোগ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সকল বিষয়েই একত্ববাদ উত্তরোত্তর অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একত্ববাদীদিগের মোট কথা এই যে, শরীর ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে, উহারা এক—কেবল এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র। একই পদার্থকে এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বস্তু বলি, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে মন বলি। এইরূপ অনুমানের সহিত কাহারও বিবাদ না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শরীর মনের সম্বন্ধ মনে ধারণা করিবার যে বিশেষ কোন সহায়তা হইল তাহা বলা যায় না। এমন কি, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ, যাঁহারা বিশ্বের সকল বিষয়েই সম্বন্ধ বাহির করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাও এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয়ে বড় নারাজ। টিণ্ডাল বলিয়াছেন যে, বস্তু ও মনের যোগাযোগের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। সম্বন্ধ যে আছে তাহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু যোগবন্ধনটি কি প্রকারের আমরা কিছুই জানি না। অবশেষে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে অতি প্রাচীন দার্শনিকদিগের সময়ে এই রহস্যটি যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল এখনও ঠিক তদ্রূপ। হক্স্‌লি বলিয়াছেন যে আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে জিনের আবির্ভাব এবং ভৌতিক পরমাণুর কম্পন হইতে মনের উৎপত্তি দুই সমান আশ্চর্য্য ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু মনিষ্ট পত্রিকার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক ফ্রান্সিস্‌ রাসেল এইরূপ নৈরাশ্যের কারণ

দেখিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে আজকাল দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রসকলের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইবার কথা।

যাহা জানা আছে তাহার সহিত অজানা বিষয়ের কোনরূপ তুলনা করিতে পারিলে—কোন প্রকার সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিলে তবেই উহাকে ধারণা করিবার সুবিধা হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের আয়ত্ত করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। লেখক মহাশয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, নূতন তত্ত্বানুসন্ধানের এই প্রথম সোপানের উর্দ্ধে উঠিতেছেন না। তিনি তাড়িৎশক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত অনুমানের সহিত বস্তু এবং মনের একটি তুলনা দিয়া, বস্তুর ক্রিয়া দ্বারা মনের প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টরূপ ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এতদিন তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রচলিত ছিল না। ইহারা যে, পরমাণুর চালনা-উদ্ভূত তাহা বহু পূর্ব্বেকার তাড়িৎযন্ত্র দেখিলেও বুঝা যায়, কিন্তু তখন ইহার অধিক কেহ জানিত না। সম্প্রতি ভৌতিক পরমাণু বিকম্পনের সহিত তাড়িৎশক্তির সম্বন্ধ কি প্রকারের তাহা অনুমিত হইয়াছে এবং এই অনুমান সম্বন্ধে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত এক মত। কিছুকাল হইল অধ্যাপক লজ্ এই বিষয়ে এক নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি যে, সর্ব্বব্যাপী ঈথরেরই ক্রিয়াবিশেষ তাহাতে কোনও বৈজ্ঞানিকের আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরে তিনি আরও সূক্ষ্মরূপে ঈথরের তাড়িতাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঈথরের দুই বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট উপাদান

আছে। ইহারা যতক্ষণ একত্রে থাকে ততক্ষণ কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়গোচর চিহ্ণ দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে—যথা কোন বস্তুর পরমাণু চালনদ্বারা—ঈথরের এই দুই উপাদানকে পৃথক্ করা যায় তাহা হইলে ইহারা পরস্পরের প্রতি গমনেচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণদ্বারা তাড়িৎশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই ত গেল বিজ্ঞানের কথা। ইহার সত্যমিথ্যার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া বস্তুর সাহায্যে মনের কি উপায়ে প্রকাশ হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ঈথর যেমন সর্ব্বব্যাপী তেমনি একটি সর্ব্বব্যাপী আত্মা বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। এই আত্মার দুই উপাদান অনুভূতি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই দুই উপাদান যখন এক হইয়া থাকে তখন পরস্পরকে তৃপ্ত রাখে—কোনরূপ চেতনার উদ্রেক হয় না, কিন্তু জীবিত স্নায়বীয় পদার্থের কম্পিত পরমাণুর সংস্পর্শে এই দুই উপাদান বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় উহাদের যে মিলনেচ্ছা জন্মে তাহাকে আমরা চেতনা বলিয়া অনুভব করি। উপাদানদ্বয়ের ন্যূনাধিক বিচ্ছেদে চেতনার তারতম্য আমরা প্রতিদিনকার ছোট ঘটনায় দেখিতে পাইতে পারি। আমাদের যে সময়ে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা নাই, আহার মনের মত হইয়াছে, শরীরের যেটুকু ক্লান্তি জন্মিয়াছে তাহা সুকোমল শয্যা এবং মৃদুমন্দ বাতাসে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতেছে, সে সময়ে আমরা সচেতন থাকি কি অচেতন থাকি বলা ভারি শক্ত। অপর পক্ষে যখন অবস্থা এইরূপ যে "পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু"—যে অবস্থা অনুভব করিতেছি বাসনা

তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটিতেছে তখন যে আমরা পূর্ণ-মাত্রায় সচেতন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মনিষ্টের লেখক মহাশয় ভরসা করিতেছেন যে জীবনের সকল অবস্থার সহিত মিলাইয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে বা এইরূপ কোন সহজ-বোধ্য অনুমানকে যদি স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে শরীর মনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে কাহারও ধাঁদা লাগিয়া যাইবার কোন কারণ ঘটিবে না।

আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি।

আমাদিগের যেমন যুগল পদ, যুগল হস্ত, যুগল চক্ষু, যুগল কর্ণ, সেইরূপ আমাদিগের মস্তিষ্কও যুগল। মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক দুই সমান অংশে বিভক্ত—একাংশ বিনষ্ট হইলেও অপরাংশে কাজ কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। দুই অংশ অক্ষত থাকিলে কাজ যতটা ভাল রকমে চলে একটির দ্বারা অবশ্য সেরূপ চলিতে পারে না। সমস্ত মস্তিষ্কপিণ্ড একপ্রকার সাদা পদার্থে গঠিত; তাহার উপরিভাগে যেন একটা ধূসর পদার্থের পাত্‌লা প্রলেপ বিদ্যমান। মস্তিষ্কের এই ধূসর অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে উহা বিচিত্র আকার-বিশিষ্ট স্নায়ু-কোষের সমষ্টি মাত্র; ঐ প্রত্যেক স্নায়ু-কোষের সহিত দুই চারিটি করিয়া সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরস্থ শুভ্র পদার্থটি নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ু-সূত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র অতি সূক্ষ্ম ও উহাদের জাল-বিস্তার অতীব জটিল। এই স্নায়ু-কোষগুলি একপ্রকার শক্তির আধার-

স্বরূপ এবং স্নায়ু-সূত্রগুলি ঐ শক্তির বাহক-স্বরূপ। মোটামুটি-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিদ্যুৎপদার্থ উৎপন্ন হইয়া যেরূপ তার-যোগে অন্যত্র প্রবাহিত হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তর-প্রদেশে দুইটি বড় বড় স্নায়ু-পিণ্ড আছে যাহাকে ইংরাজিতে "গ্যাংলিয়ন" বলে—একটির নাম "অপ্‌টিক থ্যালামস" আর একটির নাম "কর্পস্‌ ষ্ট্রায়াটম্‌"। এই স্নায়ুপিণ্ডদ্বয় উপরিস্থ ধূসর প্রলেপের সহিত স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত। উহারা স্নায়ু-শক্তির উৎপাদন, পুঞ্জীকরণ, ও বণ্টনের প্রধান কেন্দ্র-স্থল।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন পাক-চক্র ও বিবিধ অংশের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে একস্থানে কোন উৎপাৎ উপস্থিত হইলেই তাহার ফল দূরবর্ত্তী অংশেও পৌঁছিয়া থাকে। মস্তিষ্ক যে দুই অর্দ্ধাংশে বিভক্ত—সেই দুই অর্দ্ধাংশ স্নায়ু-সূত্রগঠিত একটা চোড়া পটির দ্বারা সংযুক্ত। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাতে আবার একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে—ইহারও প্রধান উপাদান স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র।

মস্তিষ্কের গঠন কিরূপ মোটামুটি তো একপ্রকার বলা হইল। এখন দেখা যাক্‌, মস্তিষ্কের ক্রিয়াসকল কিরূপে সম্পন্ন হয়। ফ্রেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ এক একটি বিশেষ মানসিক বৃত্তির আধার এবং কোন ব্যক্তির মাথার গঠন দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার বিশেষ প্রবৃত্তি কোন্‌ দিকে? তাঁহাদের মত কতদূর সত্য একথা এখানে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার মূলে যে কতকটা সত্য নিহিত আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। গল ও স্পুরজৈম্‌ এই সত্যটি আবি-

ষ্কার করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র কাজ আছে—এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষায় তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তবে, ফ্রেণলজিষ্ট-সম্প্রদায় মস্তিষ্কের যে যে অংশ যে যে প্রবৃত্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতের ঐক্য হয় না।

গল ফ্রেণলজির মত জারি করিবার অনেক দিন পরে ফ্লুরাঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কোন পশুর মস্তিষ্কের কোন অংশ সমগ্র মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সেই অংশের বিশেষ ক্রিয়া স্থগিদ হইয়া যায়। তাহার পর ষিফ্ আবিষ্কার করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অনুভব-ক্রিয়ার প্রভাবে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাপ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর ফ্রিস্ ও হিট্‌সিগ্ একটা কুকুরের মাথার খুলি অনাবৃত করিয়া তাহার মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে,মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ঐরূপে উত্তেজিত করিলে তাহার বিপরীত দিকের দেহ নড়িয়া উঠে। এই সময় হইতেই আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ফেরিয়ার হর্সলি যাফের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরও অনেক আবিষ্কার করেন।

তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কের একটা ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছেন—দৃষ্টি-কেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, স্পর্শকেন্দ্র, ঘ্রাণকেন্দ্র,আস্বাদ-কেন্দ্র এবং পৈষিক গতি-কেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্রস্থান মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে আছে তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মস্তিষ্কমণ্ডলের উপরিভাগ ও পার্শ্বে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা আত্মসম্ভ্রম, দৃঢ়তা, উপচিকীর্ষা, অনুচিকীর্ষা, বিস্ময়, আশা ও সৌন্দর্য্যানুরাগের বৃত্তি নির্দ্দেশ করেন তত্রস্থ ধূসর পদার্থের কোন হানি ঘটাইলে তাহার বিপরীত দিকের সমস্ত শরীরের পেশী-

সমূহ অসাড় হইয়া পড়ে এবং ঐ অংশ উত্তেজিত করিলে বিপরীত দিকের দেহস্থ পেশীসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মস্তিষ্কের ঐসকল অংশ হস্ত পদ, বাহু, মস্তক, মুখ ওষ্ঠ প্রভৃতির গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্র-স্থান। বাম-দিকের কপালের রগ—যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা নির্ম্মিৎসার স্থান নির্দ্দেশ করেন তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বাক্যোচ্চারণ-ক্রিয়ার গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্রস্থান। এই কেন্দ্রটি যাহার ধ্বংশ হইয়া যায় সে অভাষা (Aphasia) রোগে আক্রান্ত হয়। অভাষা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সব কথাই বেশ বুঝিতে পারে অথচ কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। উহার নিকটস্থ আর একটি অংশ ধ্বংশ হইয়া গেলে লিখন-বিকার (Agraphia) উপস্থিত হয়—যে ব্যক্তি লিখনবিকারগ্রস্ত তাহার লেখা কেহ বুঝিতে পারে না। সে ব্যক্তির হস্তচালনা ক্রিয়া নিজের আয়ত্তে থাকে না। সুতরাং যাহা মনে করে তাহা কিছু লিখিতে না পারিয়া নানা-প্রকার হিজিবিজি আঁক পাড়িতে থাকে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা লোকাদর-স্পৃহা, বাস্তনিষ্ঠা, সখ্য, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। কানের উপরিভাগে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা অর্জ্জনস্পৃহা ও জুজুপ্সার স্থান নির্দ্দেশ করেন উহা শ্রুতির কেন্দ্রস্থান। তাহার পর ঘ্রাণ, আস্বাদ এবং স্পর্শের কেন্দ্রসকল মস্তিষ্কের আরও নিম্নতর স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ফ্রেণলজি সম্বন্ধে কিছুই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না—কেন না তাঁহারা মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত করিবার সময় অন্য পার্শ্ববর্ত্তী অংশসকল দগ

করিয়া ফেলেন। মস্তিষ্কের সকল অংশের সঙ্গে যেরূপ যোগা-যোগ আছে তাহাতে একাংশ নষ্ট হইলে অন্য অংশের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না হইতেও পারে—দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি সরলতর বৃত্তির ক্রিয়া হদ্দ প্রকাশ হইতে পারে—তদপেক্ষা জটিলতর বৃত্তি প্রকাশ না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কপালের মস্তিষ্কে যে বুদ্ধিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা একরূপ স্বীকার করেন—কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তো এবিষয়ে তাঁহারা কোন বিশেষ ফল পান নাই। ফেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলিতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন ইহা বিশ্বাস করেন। ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া এইমাত্র দেখিয়াছেন কপালের রগদেশ উত্তেজন করিলে মনোযোগক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রশস্ত কপাল বুদ্ধির নিদর্শন বটে, কিন্তু শুদ্ধ কপালের মস্তিষ্কই যে বুদ্ধির স্থান তাহা নহে—মস্তিষ্কের বোধ-বাহক ও গতিবাহক যতগুলি প্রধান কেন্দ্রস্থান আছে, সকলের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রভাবে বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে কপালের মস্তিষ্ক যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কতকটা অভাব-পক্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, যে সকল জীবের কপাল-প্রদেশের মস্তিষ্কখণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায় তাহাদের বুদ্ধি লোপ পায়। তাহারা অবাধে আহার করিতে পারে কিন্তু কোথায় তাহাদের খাদ্য তাহা জানিতে পারে না। যে কুকুরের এইরূপ কপালের মস্তিষ্ক বিনাশ পায় তাহার নিকট যদি একটা অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ কর তাহা হইলে সে অস্থি ধরি-বার জন্য আগ্রহের সহিত দৌড়িয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে থামিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে না—হয়তো যেখানে অস্থিটি আছে তাহা ছাড়াইয়া কতদুর চলিয়া যাইবে।

ব্যাশ্চিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফ্রেণলজিকে যে একেবারেই উড়াইয়া দেন তাহাও ঠিক্ নহে—আবার যাঁহারা বলেন ফ্রেণলজির দ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় তাঁহাদের কথাও ঠিক্ নহে। বেন এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যুক্তি-সিদ্ধ। তিনি বলেন—"মস্তকের গঠনের সহিত মানসিক বিশেষত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনেকটা লক্ষিত হয়—তবে, ফ্রেণলজিতন্ত্রে এই সকল বিশেষত্বের যতগুলি উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কতকগুলি টি'কিয়া যাইতে পারে—আর কতকগুলি ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে।" শুধু মাথার খুলির গঠন দেখিয়া একজনের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যচরিত্রের বিশেষত্ব মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক প্রতিভাশালী বিখ্যাত লোকের মস্তিষ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কের পাকচক্র সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক জটিল। সুতরাং, মাথা বড় কি ছোট ইহা শুধু দেখিলে চলিবে না—মস্তিষ্ক-পাকচক্রের অবস্থা কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক। ফ্রেণলজিতে তাহা দেখিবার উপায় নাই। তাই, ফ্রেণলজি কতকটা সত্য হইলেও অসম্পূর্ণ।

ফ্রেণলজির সহিত আধুনিক মস্তিকতত্ত্বের আর কোন বিষয়ে ঐক্য হউক বা না হউক, ফ্রেণলজি যে মূল-ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি ও শারীরিক ক্রিয়া প্রকাশের স্বতন্ত্র কেন্দ্র-স্থল।

জাপানী সভ্যতা।

এপ্রিল মাসের ফর্টনাইট্লি রিবিউ পত্রিকায় জাপানী ব্যবহার সম্বন্ধে পিগট্ সাহেবের একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জাপানীদের যথার্থ আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্যবোধের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর এই অতি দূরপ্রান্তবর্ত্তী "অসভ্য" দেশের নিকট হইতে বলদৃপ্ত সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের শিখিবার এখনও কত কি আছে তাহাই দেখাইয়াছেন।

জাপানী আর্টের প্রশংসা এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বেও দু'একজন আর্ট-সমালোচক এমন কথা বলিয়াছেন—এবং য়ুরোপের উপরে ইহার প্রভাব যে সভ্যতাবর্দ্ধক ও উন্নতিকর এ কথা স্বীকার করিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই।

তাই বলিয়া সকল আর্টেই যে জাপান য়ুরোপকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য নয়। চিত্রবিদ্যার য়ুরোপে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে জাপানে ততদূর হয় নাই। জাপানী চিত্রকরের রচনায় ছায়া আলোকের সেরূপ পরিপাটি সন্নিবেশ দেখা যায় না। কিন্তু দুই চারিটি সূক্ষ্ম রেখাপাতে আর্টিষ্টিকতার যথেষ্ট পরিচয়। সুন্দর জিনিষকে সুন্দররূপে কেমন করিয়া ফুটাইতে হয় জাপানীরা তাহা বেশ বুঝে।

জাপানী আর্টের গৌরবই এই। কোথায় একটুখানি কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা দেখায় ভাল—একটি রেখা টানিলে অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়—একটু কারুকার্য্য করিলে চরম খোলতাই হয় জাপানীরা ঠিক ধরিতে পারে। জাপানী দোকানের একখান সামান্য পাথায়, একটা চারগণ্ডা পয়সার কাগজচাপায়, একটা যে-কোন-কিছুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানীদের মত দৈনন্দিন সামান্য ব্যবহার্য্য জিনিষেও সৌন্দর্য্য রক্ষা করার দিকে আমাদের কোন মনোযোগ নাই—কাজ চলিয়া গেলেই আমরা সন্তুষ্ট, মোটা তালপাতার পাখাই হোক্, গোলপাতার ছাতাই হোক্—দেখিতে ভালমন্দে আমাদের বড় যায় আসে না।

কিন্তু জাপানীরা সকল জিনিষকেই একটু সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের যত্নের ত্রুটি নাই। একটু কাঠকাঠরা তাহারা পড়িতে দেয় না—একটা না একটা সাজানগোছানর কাজে লাগাইয়া লয়। এবং এই সাজানগো ছানতেই জাপানীদের বিশেষ নৈপুণ্য।

ইংরাজ লেখক জাপানীদের এই গুণেই বিশেষ মুগ্ধ। তিনি সর্ব্বত্রই তাহাদের সুশোভন বিন্যাসপটুতার কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ফুলদানীতে কত রকমে ফুল সাজায়—এবং এই ফুল সাজাইবার জন্য কত রকমের ফুলদানী! সুরের বিচিত্র সমাবেশে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—ফুলের বিচিত্র সমাবেশে জাপানী বিন্যাসপটুতা তেমনি পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কণ্ডর সাহেবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ লাভ করা যায়। কিসের পর কি রঙ্ খাপ খায়, কোন্ ঋতুতে কিরূপ ফুলবিন্যাস শোভা পায়, কোন্ ফুল দেবতাকে দিতে হইবে, কোন্ ফুল বিবাহোৎসবের উপযোগী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। দুইটি তীব্র রঙের মধ্যে কোমল রঙের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। যে যে রঙে মিশ খায় না মধ্যে সবুজ পাতা কিম্বা শুভ্র ফুল দিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। ভিন্ন ঋতুর সঙ্গে ভিন্ন ফুলের যেন ভাবগত ঐক্য থাকে। বাসন্তী

ফুলবিন্যাসে নবীন যৌবনের শ্যামলতা, গ্রীষ্মকালে পরিপূর্ণ বিস্তারের ভাব, শরতে কার্শ্য এবং শীতে শুষ্ক নীরস জীর্ণতা।

ফুলদানী নানা রকমের—এবং নানারকম করিয়া ফুল সাজাইতে হয়। কণ্ডর সাহেব এক খাড়া বাঁশের নির্ম্মিত বিয়াল্লিশ রকম ফুলদানীর উল্লেখ করিয়াছেন—কোনটির নাম সিংহমুখ, কোনটি বা হংসদ্বার, কোনটি বানরদেহ, কোনটি বংশী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁশের গোড়া হইতে কাটিয়া নৌকাকারের নানা প্রকার ঝোলনা ফুলদানী প্রস্তুত হইয়া থাকে—তাহাতে এমন করিয়া ফুল সাজান হয় যে, দেখিয়া বোধ হয় যেন এক একখানি ফুলের নৌকা—ফুলের দাঁড়, ফুলের হাল, ফুলের মাস্তল। নৌকা কোনটি বিদেশাভিমুখে চলিয়াছে, কোনটি বা বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ নানা ভাবের।

শেষ কথা, জাপানের সামাজিকতা—ভদ্রতার রীতিনীতি, মেলামেশার নিয়ম, কথাবার্ত্তার ধরণধারণ। সমাজকে সুসভ্য সুন্দর করিতে হইলে কতকগুলি শিষ্টাচারের নিয়ম বিশেষ আবশ্যক। ভাষা সুশোভন এবং ব্যবহার সুন্দররূপে সুসংযত হওয়া উচিত। কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজেই ইহার অভাব দেখা যায়। ইতর বর্ব্বরতা আমাদের দেশে যে কিরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত খবরের কাগজগুলি পড়িলেই বুঝা যায়—তাহা ছাড়া সম্ভাষণ অভিবাদনের ত কোন নিয়মই নাই। জাপানীদের ইহার বিপরীত। কথাবার্ত্তার মধ্যেও সৌন্দর্য্য যাহাতে রক্ষিত হয় সে দিকে তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যদি গলা থাকে গান গাহিতে বলিলে গান না গাহা, যদি বাজাইতে জানি হুঁশ ওজর আপত্তি করিয়া তবে সুর বাঁধিতে বসা এইরূপ অসামা-

জিকতা জাপানী চরিত্রে বিরল। জাপানীদের কোটো বলিয়া একপ্রকার যন্ত্র আছে—নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে কেহ তাহা বাজাইতে জানিলে গৃহকর্ত্তা প্রায়ই তাঁহাকে বাজাইতে অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে অভদ্রতা করা হয়। বিনাইয়া বিনাইয়া ভড়ং করা জাপানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। আরও এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের তাহাদের অনেক নিয়মাদি আছে—এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাপানের অবস্থার একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী যুবকদিগের অনেকেরই মধ্যে ইংরাজী ধরণধারণ প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের বড় বড় লোক সকলেরই বিশ্বাস যে, এ বিদেশীয়ানা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না—তবে জাপানী সভ্যতা ইহার দ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে।

আদিম সম্বল।

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোন কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয় যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে, স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসঙ্গত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর এক-জনের কর্ত্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাই-য়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনি সত্যপ্রিয়তা আর একটি। ছলনার প্রতি যে একটা ঘৃণা সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনি স্বভাবসুস্থ যুবকজাতি সহজেই সত্যাচরণ করে। যদি বা কোন বয়স্ক বিজ্ঞ লোক এমন মনে করেন কথাটা সর্ব্বথা সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে অতএব সেরূপ পরাধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত; কথাটা যেমনি প্রামা-ণিক হৌক্ তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে জাতির মাথায় এই যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া [illegible]

যাই হৌক্, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই [illegible]য় না। আমার কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে; [illegible]জন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভাল [illegible]। কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু

কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সেই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্য পক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্ম্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মত বানাইয়া তাহা হইতে নির্ব্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম, বিরোধ, সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করি লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনে সময় সত্যের জন্ম হয় কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বা হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আম সমাজের যে কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনি। অ অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চি হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলে সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজন তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক তাঁহারা খুব প

বলেন সন্দেহ নাই কিন্তু এত পাকা কথা কোন মানুষের মুখে শোভা পায় না। যে খাঁটি লোক, যাহার মন শাদা, যাহার পৌরুষ আছে সে বলে ফলাফল বিচার আমার হাতে নাই, আমি যাহা সত্য তাহা বলিব লোকে বুঝুক্ আর নাই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর নাই করুক্।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কি হিসাবে দেখিব? যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্টাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্ব্বে আমরা কখন এক জাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সঙ্কল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই সমস্ত সমবেত-হৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার [illegible]ভ করিবে, এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসঙ্কোচে অসীম [illegible]তার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদান প্রদান করিতে [illegible]কবে; তাহার জ্ঞানের খণি তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহার [illegible]মের পথ সর্ব্বত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে,—তবে মনের মধ্যে [illegible]শ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে স্বাধী[illegible]তা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহা[illegible] বুড়ামানু[illegible]ষের মত তর্ক করিয়া, [illegible] তুলিয়া

তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্ম্মে, সমাজে, দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম, ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা সহকারে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

দীপশিখা।

বৈশাখ মাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্ক মহাশয় জগদানন্দ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছে তাহার কোন কোন অংশ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে।

"অঙ্গারকণা সমুদয় যেমন এখানে (দীপশিখার বহির্ভা আসিয়া পড়ে, অমনি জলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়ি যায়, জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায় না। অঙ্গারকণার অংশ জ্যো[illegible] পুড়িয়া যায় তাহাই ধূম কারে [illegible] হইতে আলো হ

না এবং তাহা অপরিষ্কার থাকে।” দেউস্কর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

উপরের লিখিত কথাগুলি যদি সত্য হয়, তবে একথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অঙ্গারক বা[illegible]ণ। [illegible] এরূপ কথা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না। যাহাকে ধূম বলি, সে জিনিষটার সঙ্গে আশৈশব পরিচয়। কতবার দেখিলাম, কতবার তাহা দ্বারা গাত্র পরিচ্ছদের মলিনতা সম্পাদন করিয়া গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলাম; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো ব্যতীত আর কোন জিনিষের লেশমাত্রও ত তাহাতে পাই নাই। “অঙ্গারক বায়ু” জিনিসটাকে লইয়াও বিস্তর নাড়াচাড়া করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ‘ধূম’ পাই নাই। না পাইবারই কথা, ঐরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষটাতে যে আবার ‘অঙ্গার’ আছে একথা পণ্ডিতেরাও ঝট্ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই শুনিয়াছি; সুতরাং অঙ্গারক বায়ুই যে দীপশিখার ধূমের কারণ একথাটা আমার মাথায় গলিতেছে না।

উত্তরদাতা মহাশয় লিখিতেছেন—“বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রভাবে অঙ্গারকণাগুলি জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া একেবারে পুড়িয়া গিয়া অঙ্গারকে বাষ্পে পরিণত করে। তাহাতেই ধূম উঠিতে থাকে।” দেউস্কর মহাশয় ধূমকে অঙ্গারক বায়ু মনে করিয়াছেন। আচ্ছা, যদি অঙ্গারক বায়ুই ধূম হয়, তবে যে শিখায় ধূম নাই, তাহাতে কি অঙ্গারক বায়ু হয় না? যদি না হয়, তবে কি হয়? আর যদি হয়, তবে তখন ধূম হয় না কেন?

অধিক বায়ু চিমনির ভিতরে গেলে কি হয়, সে কথা এখন থাকুক, খোদ্ শিখার ভিতরে অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে কি হয় তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন। দোয়াতের আকৃতি-

বিশিষ্ট কেরোসিন তেলের আলোগুলির শিখাতে কি পরিমাণ ধূম হয়, যিনি না দেখিয়াছেন, এই বেলা একবার দেখুন। ইহার ভিতরে ব্লো-পাই পর সাহায্যে বায়ু প্রবেশ করান যাউক। সর্ব্বাগ্রে ধূমের [illegible] এ[illegible] শিখার উজ্জ্বলতা ইহার ফল। আরো অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে শিখার উজ্জ্বলতার হ্রাস হইবে, কিন্তু তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাইবে—কোন অবস্থাতেই ধূম কিন্তু একেবারেই হইবে না। ধূম যে নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো, ইহা অতি অল্প যত্নেই স্থির করা যাইতে পারে। প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় যাহা দীপের উজ্জ্বলতার কারণ হইয়াছিল, অপ্রজ্বলিত অবস্থায় তাহাই ধূম। অক্সিজেনের আধিক্যই যদি ইহার উৎপত্তির কারণ হয়, তবে এই সৃষ্টিছাড়া কথাটা মানিতে হয় যে অক্সিজেন অধিক হইলে জলন্ত বস্তু নিভিয়া যায়!

শিখার অন্তর্ভাগে তৈল হইতে উৎপন্ন হাইড্রোকার্ব্বণ জাতীয় বাষ্পগুলি সঞ্চিত হইতেছে। অক্সিজেন এবং উত্তাপের সংশ্রবে এই বাষ্পগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন এবং কার্ব্বণ জন্মাইতেছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া জল হইল; সেই জল বাষ্পাকারে উড়িয়া গেল। কার্ব্বণ (অঙ্গার) কণার মধ্যে যেগুলি অক্সিজেন প্রাপ্ত হইল সেগুলি উক্ত অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারক বায়ু হইল। যেগুলি অক্সিজেন পাইল না তাহার কতক গরম হইয়া জ্বলিতে লাগিল, অবশিষ্ট অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেই শিখামুখে নির্গত হইল। যাহাতে জ্বলিল, তাহাকে আমরা শিখা নাম দিলাম, যাহা জলিতে পাইল না (অপেক্ষাকৃত ভিতরে, সুতরাং উত্তাপ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল বলিয়া) তাহা ধূমের সৃষ্টি করিল। অক্সিজেনের

আরো অধিক হইলে, আরো অধিকসংখ্যক অঙ্গারকণা তাহার সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বায়ুর সৃষ্টি করিত। এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী অঙ্গারকণা উজ্জ্বল হইয়া শিখার পুষ্টসাধন করিত। চাই কি, এর পর আর ধূম হইবার যোগ্য অঙ্গার অবশিষ্ট নাও থাকিতে পারিত। প্রজ্বলিত কার্ব্বণকণাগুলি ঐ অবস্থায় অক্সিজেনের সংশ্রবে আসিলে অঙ্গারক বায়ু হয়—নচেৎ নিভিয়া গিয়া ধূমের দলে মিশে।

অক্সিজেনটাই বাস্তবিক খুব চাই; তার পর উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট চাই। একটী কার্ব্বণকণাও যেন অপ্রজ্বলিত অবস্থায় বাহিরে আসিতে না পায়; অর্থাৎ ধূম যেন না হয়। দাহনটী যেন নিঃশেষরূপে হয়।

অগ্নিকে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিলে উত্তাপ ঘনীভূত হয়, এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তাহার উত্তাপের অপচয় হয় না। কাচ লোহা ইত্যাদি গলাইবার সময় অগ্নিদেবকে কিরূপ সংকীর্ণ কারায় রুদ্ধ করা হয়, ভাবিয়া দেখুন। চিমনি-দ্বারা এই কার্য্যটী বেশ পরিপাটীরূপে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং চিমনি দিবার পূর্ব্বে এবং পরে ল্যাম্পের উত্তাপের কিরূপ তারতম্য হয় তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে অনুভবও করা যায়।

খোলা ল্যাম্পের বাতাস পাইবার সুবিধাটা আপাততঃ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পরিমাণ ধরিলে বাস্তবিক বেশীই বটে। কিন্তু ঠাণ্ডা বলিয়া একে ত এই বায়ু শিখার তাপ হরণ করে, তাহাতে আবার শিখার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার নাই—অথচ সেটী চাই। শিখার উষ্ণ-পদার্থ বেগে ঊর্দ্ধগামী হইতেছে, যে বাতাস খুব বেগে আসিয়া তাহার গায় পড়িবে তাহা ছাড়া অন্য বাতাসের এই শ-

সহিত মিশিবার ক্ষমতা খুব কম। শিখার পদার্থ দগ্ধ হইয়া প্রবলবেগে চিমনির মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে। শূন্যতা নিবারণ করিবার জন্য বায়ু তদনুরূপ বেগে নিম্নদেশ দিয়া চিমনির ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে শিখার পদার্থের সহিত এই বাতাসের মিশিবার ক্ষমতা জন্মে; অথচ চিমনির ভিতরটা খুব গরম বলিয়া শিখার সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই তাহার ঠাণ্ডা দোষটা অনেক পরিমাণে দূর হয়। চিমনি ফাটা অথবা বায়ুর প্রবলতা উভয় কারণেই ঠাণ্ডা বাতাসের দ্বারা উত্তাপ নষ্ট হইয়া শিখার অনিষ্ট হয়।

উত্তাপ বেশী হইলে, আর উষ্ণ বায়ু শিখার পদার্থের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশিতে পাইলে শিখার আলো বাড়ে আর ধূম রহিত হয়। চিমনি দ্বারা এই দুইটী কার্য্যেরই সহায়তা করা হয়। বন্দোবস্তটী বেশ, কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে চিমনির আবিষ্কারের সময় এইরূপ উদ্দেশ্য উপায়ের আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই। চিমনির আবিষ্কর্ত্তা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পানের 'বিড়ের' আকৃতিবিশিষ্ট একটী কাগজের 'ঠোঙা' দিয়া একটী শিখাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বানরের ভাগ্যে কৌতূহলের ফল যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল সৌভাগ্যের বিষয়, সকল অবস্থাতেই সেরূপ হয় না।

এস্থলে একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েক বৎসর যাবৎ বাজারে সেণ্ট্রাল্ ড্রাফ্ট্ নামক এক নূতন কায়দার ল্যাম্প উঠিয়াছে। তাহাতে শিখার সহিত বাতাস বেশী পরিমাণে এবং ভালরূপে মিশিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ল্যাম্পের আলো পুরাতন প্রণালীর ...র আলোর অপেক্ষা পরিষ্কার।

স্বরবর্ণ 'অ'।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহারি অনুবৃত্তি-ক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

বাঙ্গলায় প্রধানতঃ 'ই' এবং 'উ' এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে গত শব্দের গ-য়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-য়ে ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণ এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখ।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্ত্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্ত্তী বর্ণে য-ফলা থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্ত্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলতঃ য-ফলা, ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্ব্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। *

---

* যফলা যেমন 'ই' এবং 'অ'র সংযোগ, বফলা তেমনি 'উ' এবং 'অ'র সংযোগ অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্ব্বনিয়ম খাটে। কিন্তু ব-ফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটা মনে পড়িতেছে, তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যথা অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, মন্বন্তরী। কম্বল, সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

ঋ-ফলাবিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃ, ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনা স্থলে আনা যায়। কিন্তু বাঙ্গলায় ঋ-ফলা উচ্চারণে ইকার যোগ করা হয় অতএব ইহাকেও পূর্ব্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না। †

অপভ্রংশে পরবর্ত্তী 'ই' অথবা 'উ' লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে। যেমন 'হইল' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ল', 'হউন' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ন' (কিন্তু 'হয়েন' শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হ'ন' উচ্চারণ হয়)। 'থলিয়া' শব্দের অপভ্রংশে 'থলে', 'টকুয়া' শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অয়)।

'ক্ষ'র পূর্ব্বেও 'অ' 'ও' হইয়া যায়। যেমন কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ। 'ক্ষ' শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'ক্ষ'র সঙ্গে য-ফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের য-ফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন। যেমন, তাঁহারা 'লক্ষটাকাকে' বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা।'

যাহা হৌক্ মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই একটা ব্যতিক্রম আছে পূর্ব্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে 'ও' স্বরবর্ণের প্রতি বাঙ্গলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত আমরা সংস্কৃত 'অ'র বিশুদ্ধ

† মহারাষ্ট্রীয়েরা 'ঋ' উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের 'অ' সংস্কৃত 'অ' এবং 'ও'র মধ্যবর্ত্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে। যেমন 'অ' এবং 'উ'র মধ্য পথে 'ও'; 'অ' এবং 'ই'র সেতুস্বরূপ 'এ'; যখন এক পক্ষে 'ই' অথবা 'এ' এবং অপর পক্ষে 'আ' তখন 'অ্যা' তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন করে। বোধ হয় ভাল করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে বাঙ্গালীরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রশ্নোত্তর।

সন্ধ্যাকালে পশ্চিম গগন লোহিতাভ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নিবেদন করিতেছি।

ফাল্গুন মাসের সাধনায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটী যাঁহারা পড়েন নাই, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে সেটা পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি।

আলোক্জনক ঈথরতরঙ্গগুলির যেমন কোনটা দ্রুত, কোনটা শ্লথ, তেমনি দ্রুতগুলির অপেক্ষা শ্লথগুলি আকারে বড়। মনে করুন লাল আলোর বড় বড় ঢেউগুলি যেন বড় বড় পাখীর ডানার ন্যায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নড়িতেছে; বেগুণী আলোর ছোট ছোট ঢেউগুলি মশা মাছির ডানার ন্যায় অতি দ্রুত-ভাবে কাঁপিতেছে।

লাঠি সোজাভাবে জলে প্রবেশ করাইলে অল্পেতেই তলা পাওয়া যায়; কিন্তু যতই 'তেরছা' ভাবে প্রবেশ করান যায়, তলা পাইতে ততই তাহার বেশীটা

জলে ঢুকাইতে হয়। আলোকের রশ্মিকেও তেমনি দুপুরবেলায় অপেক্ষা বিকাল বেলায় অনেকখানি বেশী বায়ুর ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পৌঁছাইতে হয়।

জলের তরঙ্গের পথে নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল বাধাস্বরূপ থাকিলে দেখা যায় যে, ছোট ছোট তরঙ্গগুলি উহাদের আঘাতে লোপ পায়, কিন্তু বড় তরঙ্গগুলির তত ক্ষতি হয় না—উহারা ঐ সকল প্রস্তরকে অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে।

শব্দের তরঙ্গ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। সূর্য্যের শুভ্র আলোক যেমন নানাবর্ণের অনেকগুলি আলোকের সমষ্টি, তেমনি হারমোনিয়ম ইত্যাদি যন্ত্রের এক একটী 'রীডের' আওয়াজ তীব্র গম্ভীর বহুসংখ্যক আওয়াজের সমষ্টি। তীব্র আওয়াজগুলির আতিশয্যে 'রীডের' আওয়াজ অনেক সময় কর্কশ হয়। তখন কি করা হয়? না, জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন শব্দের তরঙ্গের পক্ষে তদনুরূপ কার্য্যকারী কোন পদার্থের প্রয়োগ করা হয়। রীডগুলিকে কম্বল অথবা তদনুরূপ কোন বস্ত্রদ্বারা ঢাকিলে, তাহার লোমে বাধা পাইয়া অতিশয় তীব্র ধ্বনির নিতান্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হীনবল হইয়া যায়। তাহার ফলে রীডের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয়।

আলোকের রাজ্যেও এই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন, শব্দের তরঙ্গের পক্ষে কম্বলের লোম যেমন, আলোক-তরঙ্গের পক্ষে বায়ুতে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি তেমন। সন্ধ্যাকালে এইরূপ কণামিশ্রিত অনেকখানি বায়ুর ভিতর দিয়া আলোককে আসিতে হয়। সবুজ, নীল, বেগুণী আলোর ছোট ছোট তরঙ্গগুলি ঐ সকল কণায় বাধা পাইয়া অল্পাধিক পরিমাণে লোপ পায়। বাকি থাকে লাল, লেবুর রঙ এবং হল্‌দে রঙের আলো। ইহাদের মিশ্রণজাত আলোর যেমন রঙ তাৎকালীন আকাশের আমরা সেইরূপ রঙ দেখি।

ল্যাম্পের চিমনিতে কালী মাখাইলে তাহার ভিতর দিয়া আলোর শিখাকে অপেক্ষাকৃত লাল রঙের দেখা যায়। ইহারও কারণ ঐরূপ। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আলোকতরঙ্গগুলি কালীর কণার আঘাতে লুপ্ত হইয়া যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের মিশ্রণোৎপন্ন আলোর রং অপেক্ষাকৃত লাল হইবারই কথা।

কালীমাখান কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলে দুপুরবেলায়ই সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত লাল দেখা যায়।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গতসংখ্যক সাধনায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়াছেন—তাহার দুই একটা বিষয়ে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকার উদয়কালে বৃহত্তর দেখাইবার কারণ যে দৃষ্টির ভ্রম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই—কিন্তু যখন সূর্য্য আকাশের নিম্নদেশে থাকে তখন বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থের সহিত ইহার আকার তুলনা করা যায় বলিয়াই যে ইহাকে বৃহত্তর দেখায়—এ কথা অবিসম্বাদে গ্রাহ্য করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে—যখন অসীম মহাসমুদ্রের মধ্য হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র উদিত হয় তখনও তাহাদের আকার বৃহত্তর দেখায় এবং যত আকাশের উপরে উঠে—ততই তাহাদের আকার কমিতে থাকে। যদি একখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থ দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া কাষ্ঠফলকের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যোদয় পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলেও ইহার গোলক বৃহত্তর দেখাইবে—তখন ত আর তুলনা করিবার কিছু রহিল না—তবে কেন সূর্য্যগোলক বৃহত্তর দেখায়?

আমার বোধ হয়, শূন্য হইতে পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশকালে সূর্য্যরশ্মিসকলের বক্র পথ অবলম্বনই (refraction) এই আকার বৃদ্ধির কারণ। সূর্য্যগোলকের প্রান্ত হইতে যে সকল রশ্মি আমাদের চক্ষে পৌঁছায়, তাহারা সূর্য্য হইতে এক সরল রেখা-ক্রমে আসে না বায়ু-স্তরের গাঢ়তানুসারে বাঁকিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে এবং রশ্মিসকল যে যে সরল পথ অবলম্বন করিয়া চক্ষে পড়ে, সেই সেই সরল পথের বর্দ্ধিতাংশে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই এটী আলোকের সাধারণ ধর্ম্ম। এই বিষয়টী লইয়া একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে—যে আকার বৃদ্ধির কারণ—রশ্মি সকলের পথ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি সমান ভূমিযুক্ত দুইটী বৃত্তসূচি (Circular cone) লইয়া তাহাদের সমান ভূমিকে উভয়ের সাধারণ ভূমি করিয়া সাজান যায়,—তাহা হইলে যে একটী চিত্র হয়—সূর্য্যরশ্মির পথও প্রায় সেই চিত্রের অনুরূপ; সূচিদ্বয়ের একটী শৃঙ্গ সূর্য্য ও অপরটী দর্শকের চক্ষু।

এখন যে সূচির শৃঙ্গ চক্ষু তাহার পৃষ্ঠ যদি সাধারণ ভূমির দিকে বর্দ্ধিত করা যায়—তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অপর সূচিটীর শৃঙ্গ প্রথম সূচির মধ্যে পড়িবে—অর্থাৎ আমরা সূর্য্যের আকার বৃহত্তর দেখিব।

যখন সূর্য্য আকাশের নিম্ন ভাগে থাকে তখন রশ্মিসকল গভীর জলীয় বাষ্প ও বায়ু স্তর ও তীর্য্যক ভাবে ভেদ করিয়া আসে বলিয়া রশ্মিসকল অধিক বাঁচিয়া যায়. কাজে কাজেই সূর্য্যের আকার ও বাড়িয়া পড়ে কিন্তু সূর্য্য যতই আকাশের উপরে উঠিতে থাকে—রশ্মিসকল লম্বভাবে বায়ুস্তর ভেদ করিতে আরম্ভ করে সুতরাং রশ্মি-পথের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না, এই কারণে তখন সূর্য্যের প্রকৃত আকার দেখা যায়। শ্রীহরিদাস চৌধুরী।

প্রশ্ন।

১। যদি পৃথিবীর উপরের কোন স্থান হইতে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটা যায় এবং এই সুড়ঙ্গের এক সীমা হইতে যদি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়—তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডটীর গতি কি প্রকার হইবে? এটী কি কেন্দ্রে গিয়া নিশ্চল থাকিবে?

২। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রে পশ্চিমদিকে কামান গর্জ্জনের ন্যায় যে শব্দ শুনা যায় তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রেও এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। শুষ্ক ভূমিতে অনেক দিন পরে বৃষ্টি হইলে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয় এ গন্ধটি কিসের? শ্রীহরিদাস চৌধুরী। কৃষ্ণগঞ্জ।

৪। কিয়ৎক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিলে আমাদের মাথাটী নিম্নদিকে তলিয়ে যায়, এবং আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভাসিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা আমাদের মাথাটী ভারী। এতখানি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র মাথা কিরূপে ভারী হইল তাহা পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব।

৫। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ বেশী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া নিবে কেন?

শ্রীসতীশচন্দ্র ওয়াদাদার। চট্টগ্রাম।

সাধনা।

হিং টিং ছট্।

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ!—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়
চখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা, এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝট্পট্,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁই-ফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে!
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কানোজ কাঞ্চি মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা!
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত!
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;

কোনখানে নাহি পায় অর্থ
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গে
চুপ করে' বসে' থাকে বি
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র র
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডি
তাহাদের ডেকে আন যে যে
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদে
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ
যবন পণ্ডিত আসে, বা
গায়ে কালো মোটা মে
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বা
ভূমিকা না করি'
"সতেরো মিনি
কথা যদি থা
সভাসুদ্ধ বি
স্বপ্নমঙ্গলের
গৌড়ান

স্বপ্ন
আ

: হাস্যোজ্জলমুখে
া, হস্ত রাখি বুকে—
রাজযোগ্য বটে ;
দৃষ্টে না ঘটে!
রি অনুমান
পেয়েছিল স্থান!
ষ আছে ভূরি ভূরি,
, যত মাথা খুঁড়ি!
কহি অকপট
হা—হিং টিং ছট্!"
ত সমান,
শুনে পুণ্যবান্!

ধিক্ ধিক্—
াস্তিক

র!
তি!
কাতি!
—

সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ!
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে বিচার!
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্‌পালট্!"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

স্বপ্ন কথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,

"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল!
হাঁফ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'!
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত,
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

উমেদার।

আমি উমেদার। তিন বৎসর ধরিয়া উমেদারি করিতেছি। চেষ্টার ক্রটি নাই, হাঁটাহাঁটির কসুর নাই, কিন্তু কিছু জুটে নাই। শুনা ছিল, রাজধানীতে কাজকর্ম্মের বড় সুবিধা, তাই কলিকাতায় আসিয়াছি। জানা ছিল, মাতুল মহাশয় কলিকাতায় একটা বড় রকমের কাজ করেন, দুই একটা ভেক্যান্‌সিও নাকি তাঁর হাত দিয়া যায়, তাই সেই আশায় ভর করিয়া মামার স্কন্ধে চাপিয়াছি। কিন্তু এ হেন মণিকাঞ্চণযোগেও আমার এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা হইল না। অনেক কাজকর্ম্ম খালি হইল, সইসুপারিশ তাও সাধ্যমত জুটাইলাম, দুই এক স্থলে আশাও পাইলাম, কিন্তু কেমন পোড়াকপাল, জুটে জুটে করিয়া আজ পর্য্যন্ত কিছু জুটিল না, আমি বেকার!

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি পিতৃ[illegible] উপার্জ্জন মন্দ করিতেন না, সৎব্যয়ে ও দানধ্যানে তাঁর [illegible] যশও বেশ ছিল, এখন ঐটুকুই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাতে ত আর পেট ভরে না। পাঁচ দশ বিঘা জমাজমী সামান্য অর্থ ও অলঙ্কার ছিল, দু ভগ্নী—দুটীর বিবাহেই ত শেষ হয়। মার কষ্ট ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আঠার বয়সেই আমাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইল, তার পর উ[illegible] সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি কিন্তু আজ এই তিন বৎসরেও [illegible] কুলকিনারা দেখিতেছি না।

বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে মা, বিধবা পিসি, [illegible] ভগ্নী ও একটী ভাই। ভগ্নী দুইটী বিবাহের পর হই[illegible]

সময় শ্বশুরালয়ে থাকেন, বাকী পরিবারবর্গের অভিভাবক এখন আমি, কিন্তু আমি বেকার!

মামা কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিতেন। বাবা মামাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, উপস্থিত কর্ম্মের সোপানও নাকি তাঁহা হইতে। ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াই হোক্, অথবা কৃতজ্ঞতার খাতিরেই হোক্ মামা পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পরিগ্রহ করার বছর দুই পর হইতে খরচপত্রের টানাটানিতে মামা আর কিছুই সাহায্য করিতে পারেন না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, মামার খরচপত্রের টানাটানি বুঝিয়াও আমাকে মামার বাসায় থাকিতে হইল। মামা কিছু আশা ভরসাও দিলেন, আমি সেই সাহসে, তাঁর সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও,তাঁর গলগ্রহ হইয়া বসিয়া বসিয়া তিন বৎসর কাটাইলাম—সাধে কি বলিয়াছি, গরজ বড় বালাই!

মামার প্রথম পক্ষের একটী পুত্র আর এক কন্যা; কন্যা শ্বশুরবাটী ভবানিপুরেই প্রায় থাকেন, কখন কদাচিৎ এ বাসায় আসেন, কিন্তু দুদিনের বেশী কখনও থাকিতে দেখি নাই। ছেলেটীর বয়স দশ এগার, নাম তার রাজন। দিদিমা রাজনকে বড় আদর দেন, পাছে সেই আদরে ছেলেটী নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে দিদিমাকে কলিকাতার বাসায় রাখা হয় না, তিনি বাটীতেই থাকেন।

কলিকাতার বাসার অন্যান্য পরিবারের মধ্যে নূতন মামী, আর তাঁর তিনটী সন্তান। মামীর মাসী, মামীকে "মানুষ" করিয়াছেন, তাঁর কাছছাড়া থাকিতে পারেন না, তাই তিনি মামীর

কাছেই থাকেন! আর মামীর একটী ভাই, সে রাজনের বয়সী, মামীর বড় ন্যাওটা, সুতরাং এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। মা এখানে, বাটীতে রাঁধিয়া দিবার লোক নাই, কাজেই মামীর মাস্‌তুত ভাই, মামীর চেয়ে বছর পাঁচের বড়, সেই মাস্‌তুত বড় ভাইটী এই পরিবার শ্রেণীভুক্ত, তিনি বিবাহিত ও সপুত্রক, অতএব তাঁর দারাসুতও অধিকাংশ সময় এইখানেই থাকেন।

মামী ছেলেগুলিকে একলা সাম্‌লাইতে পারেন না, সে জন্য চাকর চাকরাণীর সংখ্যা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইয়াছে, একজন পাচকও আছেন।

মামী তাঁর বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে। মাসকাবারে মামীর পিতা নিয়মিতরূপে মামীকে প্রতিমাসে দেখিতে আসেন; এই বৃহৎ সংসার ফেলিয়া, ঘরের গিন্নি মামী বড় একটা বাপের বাড়ী যাইতে পারেন না, কাজেই মামীর মাও মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিয়া যান।

মামীর সেই মাস্‌তুতো ভাইটী আমি আসার ৩৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছেন, কিন্তু চাকরীর উপর তাঁর বড় বিতৃষ্ণা, স্বাধীন জীবন বহন করিবার ইচ্ছা তাঁহার একান্তই বলবতী, তাই আর তিনি কাজকর্ম্মের চেষ্টা করেন না। চাকর চাকরাণীরা বড় চুরী করে, সেই জন্য বাসার বাজার করার ভার তাঁর উপর, তিনি কিছু বেশী খরচ করেন বটে, কিন্তু হলে কি হয়, চাকরেরা ত আর চুরী করিতে পারে না।

বড় ঝঞ্ঝাট বলিয়া টাকাকড়ি মামা নিজে হাতে কিছু রাখেন না; পূর্ব্বে মামার কিছু বাজে খরচ ছিল, অনর্থক দানে ও আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে মাসে মাসে তাঁর প্রায় ২০৷২৫ টাকা অপব্যয় হইত, মামীর সুবন্দোবস্তে সে খরচটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

আমার আফিস নাই, সুতরাং সারাদিনই অবকাশ। আমি কলিকাতায় আসার দিন পনের পর একদিন মামীর মাসী কথায় কথায় আমায় বলিলেন, "দেখ সুরেন, একটা কথা আজ কদিন ধরে' এঁরা কেউ তোমায় বল্‌তে পাচ্চেন না—জামাই, কামিনীকে (মামীর নাম কামিনী) রোজই তোমায় বল্‌তে বলেন, কিন্তু সে ত ভাই, ভেবেই খুন, কি করে' তোমায় বলবে, সে বলে, ও কথা আমি কেমন করে' সুরেনকে বলি, পাছে সে কিছু মনে করে; আরে বাছা সুরেন তো তোর ঘরের ছেলে, তাকে আবার লজ্জা কি? কেমন কিনা ভাই! আমি বল্লেম, তোমরা কেউ না পার আমিই বলব এখন, সুরেন তেমন ছেলেই নয়, শুনবামাত্র সে হাসিমুখে স্বীকার হবে।" আমি অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই ভূমিকা শুনিতেছিলাম, তিনি সমান বলিয়াই চলিলেন, "তোমার মামা বলেন কি রাজ-নের ত পড়াশুনা ভাল হচ্চে না, যে মাষ্টারটী আছেন সেও তেমন যত্ন করে' পড়ায় না, হাজার হোক সে ত পর বই নয়; তা তুমি যদি একটু মনোযোগ কর, তবেই তোমার ভাইটের কিছু হয়, রাজনের জন্যে তোমায় আর বেশী বল্‌তে হবে না, তার যাতে ভাল হয়, তুমি তাই কর, তোমার মামা ত তোমার উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্তি! আর গোপাল তোমার মামীর ভাই, সেওত কিছু তোমার পর নয়, তাকেও একটু একটু দেখো!" আমি বলিলাম আজ্ঞে তার আর কথা কি! তিনি অমনি মামীর দিকে নয়নপল্লব বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেখ্‌লি লো কামিনী, তুই আবার ভাব্‌ছিলি, পাছে সুরেন কিছু মনে করে, হ্যাঁলা, তুই কি সুরেনের তেমনি মামী যে ইত্যাদি।

পরদিন মামা আমায় বলিলেন, "হ্যাঁ হে তুমি নাকি বাড়ীর

মধ্যে ওদের কাছে বলেছ, মাষ্টার রাজনদের ভাল করে' পড়ায় না, তুমিই এখন হ'তে ওদের পড়াবে! সেত ভালই, তুমি ভার নিলে ছোঁড়াদের কিছু হতে পারে!"

পরদিন হইতে দশ টাকা বেতনের মাষ্টার মহাশয় বিদায় পাইলেন। আমিই রাজনদের নিয়মমত পড়াইতে লাগিলাম। মামার এপক্ষের ছেলে ও মেয়েটী দুপুরবেলায় পণ্ডিতের কাছে পড়ে, আমি আসার পর মাস খানেক দেড় এই বন্দোবস্তে কাটিয়া গেল, একদিন শুনিলাম ছেলেরা খোট ধরিয়াছে, পণ্ডিত মশাই মারে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব! পণ্ডিত আসিয়া দুই দিন ফিরিয়া গেল ছেলেরা আর পড়িতে আসেনা, তাদের খোট সমানই চলিয়াছে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব। পণ্ডিত কিন্তু রোজই আসে, সাত টাকার মায়া সে বেচারী সহজে ত্যাগ করিতে চায় না—বুঝি পারেও না। মামী স্বয়ং একদিন আমায় ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু ভারি এক মুস্কিলে পড়েছি; তোমার ভাই বোন দুটী কি চোখেই যে তোমায় দেখেছে সুরেন দাদা সুরেন দাদা করেই তারা সারা! আবার কদিন থেকে খোট ধরেছে ওরা তোমার কাছে পড়বে, আর কারুর কাছে পড়তে চায় না, কি করি বল দেখি, পাছে তোমার কষ্ট হয় বলে' আমি ত তোমায় কদিন বলিইনি, তাড়াতুড়ি দিয়ে মেরে ধোরে কিছুতে ওদের যদি ভুলুতে পাল্লেম।" আমি কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছি, এমন সময় কোথা হইতে মামীর মাসী হরিনাম জপিতে জপিতে বলিয়া উঠিলেন "তা পড়াবে গো সুরেনই পড়াবে, ওকেত আর কোথায় বেরুতে হয় না, দুপুরবেলায় খেয়ে দেয়ে শুয়ে কাল কাটায় তা না-হয় ওদের নিয়ে দুদণ্ড বস্‌বে এ আর বেশী কি! কেমন সুরেন!"

এর পর হইতে ছোট ছোট ছেলেদেরও আমি পড়াইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ মামা কিছু সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিলেন, তখন আমি ছেলেদের পড়াচ্চি; মামা বল্লেন কই আজ পণ্ডিত আসেনি, আমি যথাবিহিত উত্তর দিলাম। মামা বলিলেন, বটে তুমি ত হে দেখ্‌চি অনেক খরচ বাঁচাও, আচ্ছা আসছে মাস হ'তে এখন থেকে দিদির কাছে কিছু কিছু পাঠাব, দিদির ভারি কষ্ট হয়, না? আমার টানাটানি বলেইত এতদিন কিছু পাঠাতে পারিনি! মামার এই প্রস্তাবে কিছু আহ্লাদিত হইলাম, ভাবিলাম মায়ের কোনরূপে সাহায্য হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে পারি।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি একটা প্রয়োজনে উপরে গিয়াছিলাম, নীচে আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, মামীর মাসী পাশের ঘর হইতে যেন কাকে বলিতেছেন, "ভিজে বেড়ালকে চেনা ভার, বসে' বসে' পাতড়া মারবেন, আর মামার কান ভারি করবেন, ধন্য কলিকাল যাহোক! মামাতো ভাইদের পড়িয়ে টাকা নিতে লজ্জা করে না! পোড়াকপাল আর কি!" কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম, কেননা জানিতাম, "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" বেকারের মত সহিষ্ণু জন্তু বুঝি আর দুটী নাই! কবিরা বোধ হয় বেকারের মর্ম্ম জানেন না—নতুবা এহেন দ্বিপদ বেকার থাকিতে সহ্য গুণের উপমার জন্য চতুষ্পদের শরণ লইবেন কেন?

তার পর দিন দুই গেল, মামা আর কোন কথা আমায় বলেন না, যেন কিছু লজ্জিত লজ্জিত। একদিন, হঠাৎ আমায় ডাকিয়া বলিলেন "তাইতো হে সুরেন! দিদির ত দেখি ভারি কষ্ট, তার কাছে কিছু পাঠাবার বড়ই দরকার, তা এক কাজ কর

একটা প্রাইভেট টিউসনি দেখ, তাতে যে কটা টাকা পাবে, তাই দিদিকে পাঠালেই চলবে, তার পর যাহয় করব !" মামার বিপদ বুঝিয়া বড় দুঃখেই মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, প্রণয়স্রোতে মামার আমার আজ লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি পূর্ব্ব হইতেই একটী প্রাইভেট টিউসনির জোগাড় দেখিতেছিলাম, সেই দিন হইতে আরও একটু বেশী বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলাম, উমেদারের সহিত ছোট বড় অনেক লোকেরই আলাপ। কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত বোধ হয় এত লোকের আলাপ হয় না। সবেমাত্র "সেসন" খুলিতেছে কাজেই আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না, শীঘ্রই একটী টিউসনি জুটিল, বেতন বার টাকা। তখন হইতে বাড়ীতে মার নিকট মাসে মাসে দশ টাকা পাঠাইতে লাগিলাম, অনেকটা অভাব ঘুচিল। আমি কতক নিশ্চিন্ত হইলাম, মামাও বাঁচিলেন।

এই বাঙ্গলা দেশে আমাদের মত বেকারের অন্ন জুটিতে না পারে, কিন্তু পাত্রী জুটিতে বাকী রয় না, সব বন্ধ থাকে, কিন্তু বিবাহ বন্ধ থাকে না। আমার সম্বন্ধ জুটিল, বিবাহ ত হইল। সবে মাত্র কাজের চেষ্টায় আসিয়াছি, তখনও বুকভরা আশা, মনভরা উৎসাহ, তবু সে সময় আমি বিবাহের প্রস্তাবে প্রথমে অমত করিয়াছিলাম, কিন্তু মামার অনুরোধে মামীর বেগুণফুলের কন্যার সহিত বিবাহ করিতে হইল।

বিবাহের পর বার তিনেক শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম, শেষবার শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন "বাবাজি একটা কাজকর্ম্ম কর, এমন নিশ্চিন্ত থাকাটা ত আর উচিত হয় না।"

বড় ঠাকুরঝি বলিয়াছিলেন "শুন্‌ছি নাকি তুমি খুব ফেরাই

মেরে মেরে বেড়াচ্চ, পুরুষ মানুষ দু পয়সা উপার্জ্জন না কল্লে কি মানায়!" ইত্যাদি।

আমি বেকার বসিয়া আছি, সকলেই জানেন আমার অনেক সময়! আত্মীয় মুরুব্বিগণ সকলেই বলিতেন এ বয়সে বসে' থাকা কিছু নয়, যাতে তাঁতে ঢুকে পড়; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন, শেষে কেহ অনুগ্রহ করিয়া দুই চারিটা ফাইফরমাস আমার উপর চাপাইতেন, সে ফরমাস নানা রকমের, সে সব সামান্যই কাজ—না করিয়া দিলে চলে না, আপত্তি খাটে না! একদিন ট্রামে আসিতেছিলাম, ট্রান্সফার টিকিট ছিল, বৌবাজারের চৌমাথায় নামিলাম, দেখিলাম একটী ঘোড়া বড় নাকাল, তার কাজও নাই, কামাইও নাই। যতগুলি গাড়ী আসিতেছে, চৌমাথার বাঁক পার হইবার সময় সেই ঘোড়াটিকে অতিরিক্তরূপে যুতা হইতেছে, সে বেচারী সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে, কিন্তু তার কাজ কোন কাজের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে, তার বিশ্রামের গৃহ নাই, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্রে পুড়িতেছে! তার অবস্থা দেখিয়া একবার নিজের অবস্থা মনে পড়িয়াছিল।

আমি প্রায়ই কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বড় বড় চাকরের, বড় বড় জমীদারের, বড় বড় মুরুব্বির বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই। বিশেষতঃ রবিবারে ত আমার সকাল বিকাল কামাই থাকে না। মাঝে মাঝে আফিস অঞ্চলেও যাই, আফিসে গিয়া আশা পাইয়া কোন কোন দিন বা বাবুদের বাটীতে যাই। বাড়ী গিয়া কোন বাবুর সাক্ষাতের আশায় ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করিয়া শুনিতে পাই, "বাবু আজ বড় ব্যস্ত, আর একদিন আস্‌তে বল্লেন।" কোথাও বা সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং বাবুর দর্শন লাভ ঘটে, কিন্তু

ফলটা প্রায়ই একরূপই দাঁড়ায়। কোন কোন বাটীতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না, দরোয়ানজীর অনুগ্রহে নগদ নগদ বিদায় পাই। আমি কিন্তু আশা ছাড়ি না, বাবুদের নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করি না, যদি কখন কেহ আমার এইরূপ যাতায়াতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি তখন মনে মনে নিধুবাবুর সেই গানটী ভাবি—

"আমি তোমারে দেখ্‌তে আসি দেখা দিতে আসি না।
আমার স্বভাব আমি তোমা বই জানি না।"

তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বাসায় যাই, তখন বেলা কিছু বেশী হইয়া পড়ে, বাসায় যাইয়া শুনি চাকর চাকরাণীরা আমার সম্বন্ধে নানারূপ মিষ্ট আন্দোলন করিতেছে। আহার করিতে গিয়া দেখি, ভাত বাড়া রহিয়াছে, চালের সহিত তার আর প্রভেদ করা যায় না, কোন দিন বা দেখিতে পাই, অন্নপাত্রের উপর কুকুর বিড়াল ও বায়সবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের বলবুদ্ধির পরীক্ষা করিতেছে।

মধ্যে মামার আফিসে একটী কাজ খালি হইয়াছিল, মামার কথায় বুঝিয়াছিলাম সে কর্ম্মে মামার বিশেষ হাত আছে। মামার এক জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা আছেন। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর বাসা। তিনি মামার নিকট প্রায়ই আসিতেন। লোকটি বড় ভাল, কিন্তু কিছু স্পষ্টবাদী, অন্যায়টা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তিনি আমায় কিছু স্নেহ করিতেন, আমার জন্য মাঝে মাঝে উপরপড়া হয়ে মামাকে বলিতেনও। এক্ষণে এই কাজটীর কথা শুনিয়া মহা আনন্দসহকারে মামাকে বল্লেন, "দেখো ভাই, এটা যেন আর সুরেনের ভাগ্যে ফস্কায় না।" মামা উত্তর করিলেন "না, এটা বল্‌তে গেলে একরকম আমার এক্তারেরই মধ্যে।"

দুই দিন যেতে না যেতে দেখি, মধ্যাহ্নে ব্যাগহস্তে মামার এক সম্বন্ধী উপস্থিত—ইনি মামীর সহোদর এবং কনিষ্ঠ। জানি না কেন তাঁহাকে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধটা ঠিক করিতে পারিতেছি না—তাঁহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল! বুঝি নিশীথ রাত্রে কারাগৃহে নবাবপুত্রী আয়েষাকে নির্জ্জনে জগৎসিংহের নিকট দেখিয়া ওসমানের হৃদয় এমনই কাঁপিয়াছিল! সেই দিন মাতুল মহাশয় যখন আফিস হইতে ফিরিলেন, আমি তখন কার্য্যান্তরে উপরে ছিলাম; দেখিলাম মামা ঘরে যাইবা-মাত্র, পাখা হাতে মামী, তাড়াতাড়ি, মামার চাপকানের বোতাম খুলিয়া দিতেছেন, আমি অন্তরালে ছিলাম, হঠাৎ এ ঘটনাটী আমার চক্ষে পড়িল! মামার চক্ষের সেই সহাস্য দৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গের সেই আবেশময় সৃষ্টি আর মুখের সেই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বুঝি এ সুখসম্ভোগ মামার পক্ষে বড় সুলভ নহে!

পরদিন একটু সকাল সকাল মামা আফিস চলিয়া গেলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আফিস যাইবার কথা, মামা কিছু না বলায় ভাবিলাম তাড়াতাড়িতে বুঝি বা ভুলে গেছেন; মামার আফিস চিনিতাম, আহারান্তে আফিস গেলাম। গিয়া দেখি, মামা তাঁর সেই সম্বন্ধীটীকে বড় সাহেবের সহিত পরিচয় করাইতেছেন, সাহেবের মুখে একমুখ হাসি, মামাও যেন টিপিটিপি হাসিতেছেন, কেবল মামার সম্বন্ধী বেচারা যেন কিছু অপ্রতিভ অপ্রতিভ! মামা আমাকে দেখিতে পান নাই, আমি সরিয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইলাম। মামা যখন সসম্বন্ধী সাহেবের নিকট হইতে ফি[illegible] ছিলেন, আমি সম্মুখে পড়িলাম, মামা আর আমার [illegible] ইতে পারিলেন না, কেবল গম্ভীরভাবে বলিলে[illegible] হয়ে গেছে!"